চমক হাসান

যুক্তিফাঁদে ফড়িং





'আমি ব্যাগ কোথায় রাখব, সেটা তুই বলার কে? যতসব চাষাভূষা-মূর্খ লোকজন আমাকে ঠিক-বেঠিক শেখাতে আসছে!'...

হাসিব মনে মনে বলল, 'Ad Hominem! অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ। ব্যাগ রাস্তায় রাখা যাবে না, এই কমনসেন্সের জন্য ছেঁড়া জামা কিংবা চাষাভূষা হওয়ার কোনো সংযোগ নেই। এখানে যেটা হয়েছে, সেটা একটা Logical Fallacy। যুক্তির ভ্রান্তি...

হাসিবের মাথার ভেতরে যুক্তির ভ্রান্তিগুলো ঘুরতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিতর্ক করতে সে দারুণ ভালোবাসত। এই যুক্তির ভ্রান্তিগুলো তখন মাথায় রাখাটা খুব জরুরি ছিল। এগুলো অবশ্য এখনো জরুরি। জীবনে চলতে-ফিরতে কত জায়গায়ই না এসব দেখা যায়! এগুলো থেকে সতর্ক হওয়াটা দরকার...

তাই বলে তুমি এমন করো, তর্কে জেতার জন্য-
এমন করেই বদলাও কথা মানে হয়ে যায় অন্য

প্রচ্ছদ: নিশাত বিনতে মনসুর

যুক্তিফাঁদে ফড়িং

চমক হাসান



আদর্শ

উৎসর্গ

মাহমুদুল হক তমাল

আমার প্রাণপ্রিয় ভাই, আমার প্রথম বন্ধু

স্মৃতির জানালায় ফিরে তাকালে যে মুখচ্ছবিগুলো ভাসে, সেখানে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকো তুমি। এখনো মনের ভেতর তোমার সঙ্গে হাঁটি শোমসপুর বাজারের অলিগলিতে। কাঁচাবাজার শেষে দুই টাকার খোরমা কিনে খাই। আর পরের মুহূর্তে তাকিয়ে দেখি কুষ্টিয়ার শাহীন বেকারির সামনে আমরা। ১০০ গ্রাম জিলাপি কিনি, এন এস রোডে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি। এই দূর পরবাসে কষ্টে জোগাড় করা পাটালি গুড় আর মুড়ি যতবার মুখে দিই, দেশি দোকানে সাজিয়ে রাখা জিলাপির দিকে যতবার তাকাই, প্রতিবার তোমার কথা মনে পড়ে। এখনো ট্রেনের ইঞ্জিনে চড়ে কুমারখালী যাওয়ার সেই অভিযানের কথা ভেবে শিহরিত হই।

সুস্থ থেকো, ভাইয়া। নিশ্চয়ই স্মৃতির পাতায় আরও অনেক মুহূর্ত জমবে আমাদের।

সূচি

ভূমিকা

আমরা একটা দারুণ সময়ে বসবাস করছি এখন। ইন্টারনেট আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এই সময়ে আমাদের জীবনযাপনের অনুষঙ্গ হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এটার একটা জাদুকরী প্রভাব পড়েছে সমাজে। সাধারণ মানুষ তাদের কথা ও কাজকে খুব সহজে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে। একটা সময় ছিল যখন নিজের লেখা কিংবা নিজের সৃষ্টিকর্মকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হলে তাকে একটা বই প্রকাশ করতে হতো কিংবা তার কাজগুলোকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করতে হতো। সবার পক্ষে সেটা সম্ভব হতো না। এখন এই প্রকাশের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। অন্তর্জালে ব্লগে অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর নানা গ্রুপে তারা সৃষ্টিশীল কাজগুলো সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারছে। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে তাকালে আমরা তাই অসাধারণ সৃষ্টিশীল কিছু কাজ দেখতে পাই।

কিন্তু প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটা খারাপ দিকও আছে। মানুষ তাদের মনের অন্ধকার দিকগুলোও অবলীলায় এখানে প্রকাশ করে ফেলছে। কুরুচিপূর্ণ পোস্ট, মতামত কিংবা মন্তব্য চোখে পড়ে অহরহ। এসব পোস্টে কিংবা মন্তব্যে যে যার মতো উল্টোপাল্টা যুক্তি দিচ্ছে। ভুলভাল তথ্য ছড়াচ্ছে। 'জাল খবর' বা ফেইক নিউজের পরিমাণও বাড়ছে।

আমার মনে হয়, এখন একটা ভালো সময় যৌক্তিকভাবে সচেতন হওয়ার। যে যা বলছে তা মেনে না নিয়ে একবার ভেবে দেখার। যুক্তির নিক্তিতে একবার পরখ করে নেওয়া যে তাদের কথায় কিংবা যুক্তিতে

ফাঁক রয়ে গেল কি না। যারা পাঠক, তাদের যেমন জানা দরকার, তেমনি জানা দরকার যারা বক্তা তাদেরও।

আসলে সেই চিন্তা থেকেই এই বইটি লেখা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে মানুষ আমাকে চেনে গণিতের ভিডিও আর লেখালেখির কারণে। গণিত আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমার প্রথম ভালোবাসা। আর গণিতের যেখানে ভিত্তি, সেটা হচ্ছে যুক্তি। যুক্তি ব্যাপারটা ভালো করে না জানলে গণিত-বিজ্ঞানের চর্চা ঠিকমতো করা যায় না। যুক্তি নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়, তাকে বলে যুক্তিবিদ্যা, যেটা বহু প্রাচীন একটা বিজ্ঞান। এই বইয়ে যুক্তিবিদ্যার নানা রকম পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা যেত। কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই সেগুলো এড়ানোর চেষ্টা করেছি, যেন এ বইটা একাডেমিক পাঠ্যবইয়ের মতো না হয়ে যায়। আমি চেয়েছি বইটি যেন সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যেতে পারে। আমার আশা, তাহলে মানুষ চলতে-ফিরতে কথা বলার সময় কুযুক্তি কিংবা যুক্তির ভ্রান্তিগুলো নিয়ে সতর্ক থাকবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, যুক্তি ব্যাপারটাকে সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায় তখনই, যখন এর দুর্বলতাগুলো বোঝা যায়। যখন এর ভ্রান্তিগুলোকে অনুভব করা যায়। এই বইটিতে যুক্তির নানা রকম ভ্রান্তি (ইংরেজিতে বললে logical fallacy) নিয়ে আলোচনা করেছি।

এই বইটি যে আমি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারছি, তার জন্য কিছু মানুষের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এখন থেকে দুই বছর আগে বুয়েটের সিনিয়র বড় ভাই নিউটন এম এ হাকিম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন লজিক্যাল ফ্যালাসি নিয়ে একসঙ্গে একটি বই প্রকাশ করার। আমরা একসঙ্গে শুরু করেছিলাম, কিন্তু পরে সময়ের অভাবে কাজটা আর এগিয়ে নিতে পারিনি। এ বছর কিছুটা সময় পেয়ে নিজেই কাজটা করে ফেলেছি। পরে সময় পেলে একসঙ্গে আরেকটু বড় পরিসরে এই বিষয়টা নিয়ে লেখালেখির ইচ্ছে আছে। নিউটন ভাইয়ের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। এ ছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি টেন মিনিট স্কুলের আয়মান সাদিকের কাছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা লাইভ অনুষ্ঠান করেছিলাম। সেখানে যুক্তির বিভ্রান্তিগুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ

হয়েছিল। এই বইটি এ বছর শুরু করার পেছনে ওই অনুষ্ঠানটি একটা বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

আদর্শকে ধন্যবাদ, নিয়মিত তাগাদা দিয়ে যাওয়ার জন্য। বন্ধু মাহফুজ সিদ্দিকী হিমালয়কে ধন্যবাদ বইটির নাম নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আমার সহমানুষ ফিরোজা বহ্নি এবং আত্মজা বিনীতা বর্ণমালাকে ধন্যবাদ, তাদের ভাগের একটু সময় এই বইয়ের পেছনে ব্যয় করতে দেওয়ার জন্য। শুধু লেখালেখি না, আমার সানন্দে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রেরণা, সবচেয়ে বড় অবলম্বন তোমরা!

বইটি পড়ে মানুষের যুক্তিবোধ আরেকটু শাণিত হোক, যুক্তির ভ্রান্তিগুলোর ব্যাপারে মানুষ সচেতন হোক, লেখক হিসেবে এটুকুই চাওয়া।

চমক হাসান
সান্তা ক্লারিটা, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
মার্চ, ২০২১

গল্প শুরুর আগে

ভ্রান্তি চারিদিকে

আন্তনগর মধুমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভেতরে বসে আছে হাসিব, গন্তব্য 'খোকসা'। ঢাকা থেকে বাসে করে আসা যেত, তাতে সময় অনেক কম লাগত। তবু সে ট্রেনেই আসবে ঠিক করেছিল। ট্রেনে চড়লে নাকি একটা আয়েশি ভাব আসে ওর, ট্রেনের ছন্দ আর দুলুনিতে মনটা খুশি খুশি লাগে। তা ছাড়া স্টেশনে স্টেশনে মানুষের ওঠানামা দেখতে ভালো লাগে। আর নানা রকম মানুষের নানা রকম কথা শোনাটাও একটা বিনোদনের মতো। এসব ভাবতে ভাবতেই একটা চেঁচামেচি কানে আসে ওর।

পেছনে তাকিয়ে দেখে বেশ অভিজাত জামা-জুতো পরা কেতাদুরস্ত একজন মানুষ গলা উঁচিয়ে ঝাড়ি দিচ্ছে লুঙ্গি আর ছেঁড়া শার্ট পরা একজন মানুষকে।

'আমি ব্যাগ কোথায় রাখব সেটা তুই বলার কে? যতসব চাষাভূষা-মূর্খ লোকজন আমাকে ঠিক-বেঠিক শেখাতে আসছে!'

কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, কেতাদুরস্ত লোকটা ব্যাগ রেখেছিল ট্রেনের কামরার রাস্তার মাঝখানে। ছেঁড়া জামা পরা লোকটা বলেছিল ওটা পাশে সরিয়ে রাখতে যেন মানুষের চলাচলে সমস্যা না হয়। ব্যাগ সরিয়ে রাখাটাই ঠিক ছিল, অথচ বেচারা ঠিক কথাটা বলতে গিয়ে ঝাড়ি খেল। হাসিব মনে মনে বলল, 'Ad Hominem! অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ। ব্যাগ রাস্তায় রাখা যাবে

না— এই কমনসেন্সের জন্য ছেঁড়া জামা কিংবা চাষাভূষা হওয়ার কোনো সংযোগ নেই। এখানে যেটা হয়েছে, সেটা একটা Logical Fallacy। যুক্তির ভ্রান্তি।'

সামনের সিটে একটা ছোট্ট মেয়ে বসে ছিল তার মায়ের সঙ্গে। মেয়েটাও চেঁচামেচি শুনেছে। সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, এভাবে কথা বলাটা কি ঠিক? মা বলল, 'আম্মু, তুমি ঠিকমতো লেখাপড়া করো, বড় হও, তখন ঠিক-বেঠিক বুঝতে পারবে।' হাসিব মনে মনে হাসে, 'এখানেও ফ্যালাসি— Red Herring! প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়া। মেয়ের প্রশ্ন ছিল, লোকটার আচরণ ঠিক না বেঠিক সেটা নিয়ে। মা সেটার উত্তর না দিয়ে লেখাপড়ায় ঢুকে গেছেন। এখানেও একটা ফ্যালাসি ঘটেছে।'

হাসিবের মাথার ভেতরে যুক্তির ভ্রান্তিগুলো ঘুরতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিতর্ক করতে সে দারুণ ভালোবাসত। এই যুক্তির ভ্রান্তিগুলো তখন মাথায় রাখাটা খুব জরুরি ছিল। এগুলো অবশ্য এখনো জরুরি। জীবনে চলতে-ফিরতে কত জায়গায়ই না এসব দেখা যায়! এগুলো থেকে সতর্ক হওয়াটা দরকার।

চেঁচামেচি কমে এসেছে। হাসিব জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ট্রেনের গতি কমছে। দূরে দেখা যায় কুমারখালী রেলস্টেশন, ওখানে এখন থামবে তার ট্রেন। আর এর পরের স্টেশনেই ওকে নামতে হবে। খোকসা। ওর শৈশবের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকা খোকসা।

নতুন জীবনের পথে

খোকসা রেলস্টেশনে নেমে কিছুদূর এগোতেই স্কুলের নামটা চোখে পড়ে হাসিবের— 'শোমসপুর উচ্চবিদ্যালয়'। আগামী কয়েকটা মাস কিংবা হয়তো কয়েকটা বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করেই কাটবে তার। হাসিবের বাবা-মা কেউই তার এই পাগলামিতে খুব একটা খুশি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এত ভালো ফল নিয়ে পাস করে কেউ গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতে যায়?

'বিসিএস দিতে পারতি! সরকারি চাকরি ভালো না লাগলে একটা বেসরকারি চাকরি নিতি! বৃত্তি নিয়ে বাইরে লেখাপড়া করতি, তাই বলে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি?'

'এভাবে গ্রাম কেন বলছ? শোমসপুর কি এখন আর সেই অজপাড়াগাঁ আছে? ইন্টারনেট আছে, ডিশ লাইন আছে। লোডশেডিংও খুব একটা হয় না। আর আমি তো সারা জীবনের জন্য যাচ্ছি না। কয়েকটা মাস মাটির খুব কাছাকাছি থাকার এই অভিজ্ঞতাটা আমি চাই।' মা-বাবাকে হাসিব বোঝানোর চেষ্টা করেছে অনেক। তারা বোঝেননি।

মা-বাবার গোমড়া মুখের কথা ভেবে এখন হাসি পায় হাসিবের। ছাত্রজীবনে বিতার্কিক হিসেবে পরিচিতি ছিল। যুক্তির ঘায়ে কতজনকে কুপোকাত করেছে কতবার। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে এসে সে বারবার হেরে যায়। কী জানি! কিছু কিছু সময় হয়তো হারতেই ভালো লাগে।

দ্রুত পা বাড়িয়ে রহমত চাচার বাড়ির দিকে এগোয় ও। ওই বাড়িতেই থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। আগামীকাল থেকে তার সংক্ষিপ্ত বেকার জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে। এখন থেকে তার পরিচয় হবে অঙ্ক-বিজ্ঞানের মাস্টার হিসেবে— এটা ভেবে হাসিবের হাসি পায়!

যেটা হাসিব জানত না তা হলো, এই স্কুলে ওর যে আনন্দময় স্মৃতিগুলো তৈরি হবে, সেগুলোতে অঙ্ক-বিজ্ঞানের জায়গা কমই থাকবে। ওর সুন্দর মুহূর্তগুলো কাটবে বরং যুক্তির সঙ্গে, যুক্তির ভ্রান্তির সঙ্গে।

যুক্তি আর ভ্রান্তির প্রথম পাঠ

শোমসপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিকুল সাহেব হাসিবের বাবার বন্ধু ছিলেন। হাসিবকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে তিনি খুব খুশি। হাসিবকে ডেকে সন্তানস্নেহে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। ওকে দেওয়া হলো অষ্টম, নবম আর দশম শ্রেণির ক্লাস। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নের অনেক ক্লাসই ওকে নিতে হবে। অন্য সবার সঙ্গে কথা বলে হাসিব বুঝতে পারল, হাইস্কুলের কাজের চাপ আসলে ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি!

প্রথম দুটো ক্লাস বেশ মসৃণভাবে নেওয়ার পর তৃতীয় ক্লাসে গিয়ে ও মূল প্রসঙ্গ থেকে বেশ দূরে সরে গেল।

ক্লাসে অঙ্ক শেখাচ্ছিল হাসিব। একটা অঙ্ক শিখিয়ে আরেকটা সবাইকে করতে দেয়। সময় দেয় পাঁচ মিনিট। ঠিক করেছিল সময় শেষ হয়ে গেলে ও দুই-তিনজনের খাতা দেখবে। এমন সময় হুট করে হাসিবের মাথায় একটা চিন্তা আসে: দুই-তিনজনের খাতা দেখেই কি বোঝা যাবে 'সবাই' শিখেছে নাকি? অল্প নমুনা দেখে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা সব সময় যৌক্তিক নয়। 'Hasty Generalization' বলে একটা ফ্যালাসি আছে। যা হোক, পরে ভাবা যাবে। ভাবনার জন্য বিষয়টা আপাতত তুলে রাখে।

পাঁচ মিনিট সময় শেষ। হাসিব ইচ্ছেমতো একজনের খাতা টেনে নেয়। হাসিব জানে উত্তর হওয়ার কথা শূন্য। সেই ছাত্রের উত্তরও

এসেছে শূন্য। কিন্তু হাসিব দেখে, ছাত্রটা অনেক গোঁজামিল দিয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তর মিলিয়ে দিয়েছে। হাসিবের হাসি পায়। ওর মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের এবার একটু জ্ঞান দেওয়া দরকার। হেঁটে হেঁটে ও বোর্ডের কাছে যায়, ছাত্রছাত্রীদের দিকে ঘুরে মুখ হাসি হাসি রেখে বলে,

বলো তো, আমরা যখন অঙ্ক করি, তখন কোনটা বেশি জরুরি, উত্তরটা নাকি পদ্ধতিটা?

ছেলেমেয়েরা একটু দ্বিধান্বিত হয়ে যায়। অঙ্ক ঠিকমতো করেও যদি ছোট ভুলের কারণে উত্তরটা ভুল আসে, স্যাররা সব নম্বর কেটে রাখেন। এ থেকে ওদের মনে হয় উত্তরটাই বেশি জরুরি।

হাসিব ছাত্রছাত্রীদের দ্বিধাটা টের পায়। তারপরে বলে,

উত্তর অবশ্যই জরুরি। তবে গণিতে পদ্ধতিটা আরও বেশি জরুরি। অনেক সময় ভুল চিন্তা থেকেও ঠিক উত্তর আসতে পারে। মনে করো, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম ৫ দুগুণে কত হয়। সে উত্তর দিল এভাবে।

১ আর ৪ যোগ দিলে ৫ হয়।

৭ আর ৩ যোগ দিলে হয় ১০।

তাহলে আমার মনে হয় ৫ দুগুণে ১০ হবে।

তোমাদের কী মনে হয়, এটা কি ঠিক হলো? উঁহু। দেখো, এখানে তিনটা বাক্যের কোনোটাই ভুল না। কিন্তু ভুলটা হলো যুক্তি গঠনে। প্রথম দুই লাইন থেকে শেষ লাইন কী করে এল, কেউ জানে না। অঙ্কের ফল ঠিক এসেছে কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। কোন পথ ধরে এল, সেটা খুব জরুরি।

আজকের ক্লাসে তোমাদের আর গণিত শেখাব না, তোমাদের একটু যুক্তি শেখানো যাক। তোমরা কি রাজি?

সবাই একবাক্যে বলল, 'জি স্যার'। আজকে ক্লাসে স্যার আর অংক করাতে চান না, এটাতে সবাইকে বেশ খুশি মনে হলো। ওদিকে বোর্ডটা পরিষ্কার করে লিখল 'যুক্তিবিদ্যা'।

যুক্তি (ARGUMENT)

গণিতে, বিজ্ঞানে কিংবা রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে তর্ক-বিতর্কে মানুষ সব জায়গাতেই যুক্তি প্রয়োগ করছে। এসব যুক্তির গঠন কেমন, সেগুলো কি আসলেই ঠিক যুক্তি নাকি ভুল, এমন নানা বিষয় নিয়ে ভাবা হয় যুক্তিবিদ্যায়।

যুক্তিবিদ্যা নিজেই অনেক বড় একটা বিষয়। শুধু এটা নিয়েই অনেক অনেক পড়ালেখা করা যায়। আমি অবশ্য যুক্তিবিদ্যার অনেক গভীরে যাব না। যুক্তি প্রয়োগের সময় আমরা কী ধরনের ভুল করি তার কয়েকটা তোমাদের দেখাব।

যুক্তি দেওয়ার সময় যেসব ভুল আমরা করি, সেগুলোকে বলে 'logical fallacy' বা যুক্তির ভ্রান্তি। আরেকটা গালভরা বাংলা নামও আছে এটার– 'হেত্বাভাস'। হেতু+আভাস এমন সন্ধি করে শব্দটা এসেছে। এই নামটার কথা হয়তো পরে কখনো বলব। এখন আমরা ভ্রান্তি শব্দটা ব্যবহার করব। মাঝে মাঝে সরাসরি ইংরেজি থেকে নিয়ে ফ্যালাসি শব্দটাও ব্যবহার করব।

ভুলগুলো বোঝার আগে চলো একটু যুক্তি ব্যাপারটার দিকেই তাকাই। কখনো খেয়াল করেছ কী, আমরা যখন যুক্তি দিই, সেটার কাঠামোটা কী রকম হয়?

খুব সহজ করে বললে, যুক্তি দেওয়ার সময় কিছু একটা কথার ভিত্তিতে আমরা কিছু একটা দাবি। যেমন ধরো কেউ বলল, মাথাটা খুব ব্যথা, তাই স্কুলে যাব না। এখানে তার মূল কথা হলো, 'সে স্কুলে যাবে না'। এটাকে বলে 'সিদ্ধান্ত (conclusion)'। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সে কিসের ভিত্তিতে পৌঁছাল? 'মাথাটা খুব ব্যথা'– এই বাক্যের

ভিত্তিতে, এই তথ্যের ওপর আশ্রয় করে। ওই তথ্যকে বলে 'আশ্রয় বাক্য (premise)'।

মাথাটা খুব ব্যথা (আশ্রয় বাক্য)

তাই স্কুলে যাব না (সিদ্ধান্ত)

আশ্রয় বাক্য একটা হতে পারে, একের বেশিও হতে পারে। যেমন খুব প্রচলিত একটা যুক্তির কথা বলা যেতে পারে,

মানুষ মরণশীল (আশ্রয় বাক্য ১)

হাফিজ একজন মানুষ (আশ্রয় বাক্য ২)

অতএব, হাফিজ একদিন মরবে (সিদ্ধান্ত)

খেয়াল করো, এখানে কিন্তু আশ্রয় বাক্য দুটো।

হাসিবের কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্লাসের পেছন থেকে হাসির শব্দ পাওয়া যায়। হাসিব জানত না যে ওই ক্লাসে হাফিজ নামে একটা ছেলে আছে। সে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, তাই বলে যুক্তি শেখাতে গিয়ে আমাকে মেরেই ফেলবেন!' পুরো ক্লাস খিলখিল করে ওঠে।

পেছন থেকে কেউ একজন মুখ লুকিয়ে বলে, 'স্যার, হাফিজকে কিন্তু বেশি ঘাঁটাবেন না, সে আমাদের ক্লাসের বুনোকবি। আপনাকে নিয়েও যে কী লিখে ফেলবে, লুকানোর জায়গা পাবেন না।'

'আচ্ছা মাথায় থাকবে ব্যাপারটা', হাসিব একটু হেসে আবার যুক্তির জগতে ফেরে।

এই আশ্রয় বাক্য আর সিদ্ধান্ত ছাড়াও যুক্তির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান আছে। সেটাই আসলে যুক্তির প্রাণ। তাকে বলে 'Inference' বা অনুমিতি। আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে আসার ধাপ হলো এই অনুমিতি। এটা হলো আশ্রয় বাক্য আর সিদ্ধান্তের সেতুবন্ধ।

চলো এবার যুক্তির ভুলগুলোর দিকে তাকানো যাক।

ভ্রান্তি (FALLACY)

একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছি, মানুষ যুক্তি প্রয়োগ করার সময় নানা রকমের ভুল করে, এগুলো ইংরেজিতে বলে fallacy। এই ভুলগুলো মূলত দুই রকমের হয়।

১. Formal fallacy বা কাঠামোগত ভুল: সেখানে আশ্রয় বাক্য ঠিক থাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথটা ভুল হয়। যুক্তি গঠনের প্রক্রিয়াটাই এখানে ভুল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেই পাঁচ দুগুণে দশ-এর অঙ্কটার কথা। আরেকটা ভাবতে পারো,

> মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না (আশ্রয় বাক্য ১)
>
> আজ বৃষ্টি হয়নি (আশ্রয় বাক্য ২)
>
> অতএব, আজকে মেঘও হয়নি (সিদ্ধান্ত)

দেখো, এটা কিন্তু ঠিক যুক্তি নয়। বৃষ্টি হয়নি মানেই যে মেঘও হয়নি– এটা বলা যায় না। শরতের সাদা মেঘ থেকে প্রায়ই হয়তো বৃষ্টি হয় না। এখানে প্রথম দুটো বাক্য যদি ঠিকও আছে, তিন নম্বর বাক্যটা ওটা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এখানে যুক্তির কাঠামোতেই ভুল।

ভুলগুলোর আরেকটা প্রকার হলো–

২. Informal Fallacy বা আশ্রয় বাক্যের ভুল: এখানে আশ্রয় বাক্যটার ভেতরেই ঝামেলা থাকে। এই ধরনের ভুলই আসলে বেশি চোখে পড়ে। আশ্রয় বাক্যটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন মনে হয় আরে, উনি তো ঠিকই বলছেন, কিন্তু আশ্রয় বাক্যটার দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়, তিনি ভুলভাবে বা বিকৃতভাবে আশ্রয় বাক্যকে উপস্থাপন করেছেন।

যেমন ধরো,

> বিখ্যাত ক্রিকেটার 'ক' বলেছেন, বিজ্ঞান মানুষের জন্য অভিশাপ (আশ্রয় বাক্য)
>
> অতএব, বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকা উচিত (সিদ্ধান্ত)

এখানে যুক্তির গঠনে খুব একটা সমস্যা নেই। একজনের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি।

কিন্তু ঝামেলা আছে আশ্রয় বাক্যটার ভেতরে। আশ্রয় বাক্যটা নিজেই গ্রহণযোগ্য কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। একজন ক্রিকেটার বিজ্ঞান নিয়ে কী বলল, সেটা কেন গ্রহণযোগ্য, ব্যাপারটা পরিষ্কার না। এমন ভ্রান্তিকে বলে Appeal to questionable authority। পরবর্তী সময়ে এগুলো আরও বিস্তারিত শেখাব তোমাদের।

ঘড়ির দিকে তাকায় হাসিব। ক্লাসের সময় শেষ। সবাইকে বলে, 'আমি ঠিক করেছি আগামী ক্লাসেও অঙ্ক পড়াব না। মানুষ কী অদ্ভুত ধরনের উল্টোপাল্টা যুক্তি দেয়, সেগুলোর শোনাব তোমাদের! শুনতে চাও?'

সবাইকে বেশ খুশি মনে হয়। এমন ধরনের কথা আগে কেউ ওদের বলেনি।

মূল বিষয় রেখে কাকে আক্রমণ করছ

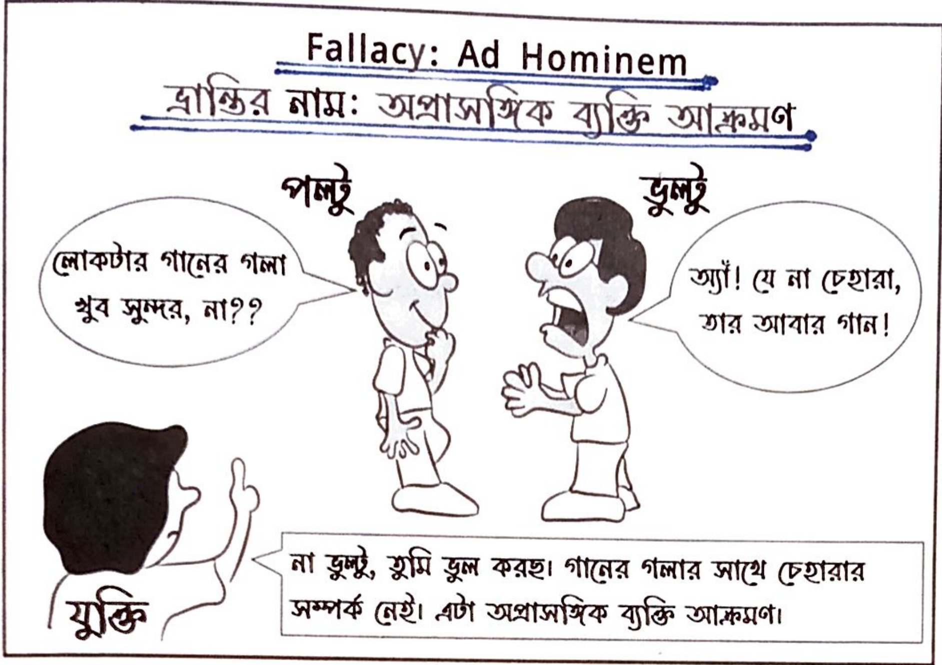
পরের ক্লাসে হাসিব ঢুকল কয়েকটা কাগজ নিয়ে। বিতর্ক যখন করত, ডায়াসে দাঁড়ানোর সময় হাতে কতগুলো কাগজ রাখত। সেখানে ও কী কী বিষয় নিয়ে বলবে, সেগুলো ছোট ছোট করে নোট করে রাখত। সেই অভ্যাস এখনো রয়ে গেছে। একটা কাগজ দেখে ও বলল, 'আজকে তোমাদের ভুলভাল যুক্তিসংক্রান্ত তিনটা ফ্যালাসি বোঝাব। খেয়াল করলে দেখবে এমন ভ্রান্তিগুলো হরহামেশাই দেখা যায়। তিনটাই informal fallacy, অর্থাৎ যুক্তির গঠনে ভুল নেই, কিন্তু আশ্রয় বাক্যে ঝামেলা!

আজ যে ফ্যালাসিগুলো বলব, সেখানে তোমরা খেয়াল করবে, মূল বিষয় বা মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে আক্রমণ করা হচ্ছে!

এদের প্রথমটার নাম হলো 'Ad Hominem' বা অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ। এটার উদাহরণ চোখ-কান খোলা রাখলে তোমরাও হয়তো দেখতে পাবে। চলো দেখি কী করে অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ করে যুক্তি দেওয়ার বা ভন্ডুল করার চেষ্টা করা হয়।

ভ্রান্তির নাম AD HOMINEM– অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ

একটা উদাহরণ দিয়েই শুরু করা যাক। এটা আমাদের সমাজে খুবই চেনা একটা ব্যাপার যে মানুষ কোনো একটা বিষয়ে আরেকজনকে ছোট করতে গিয়ে বাপ-মাকে টেনে আনে। হয়তো বাপ-মায়ের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটার কোনো সংযোগই নেই। এখানে যেটা করা হয়, বিনা কারণে ব্যক্তি আক্রমণ করে কুযুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।



উদাহরণ ৩.১: মনে করো, একজন কৃষক এসেছে গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে। এসে বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব, এবার মনে হচ্ছে ফসলের অবস্থা ভালো না। যদি সম্ভব হয় আপনি ওপরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আমাদের ত্রাণট্রান লাগতে পারে।' শুনে চেয়ারম্যান বলল, 'তুই জানি ক্যাডা? তোর বাপ তো ছিল ফকির, তাই না? ভিক্ষা করে খেত। ফকিরের ছেলে, সে আসছে আমাকে জ্ঞান দিতে– কী করব না করব! যা, ভাগ এখান থেকে।'

যদি আশ্রয় বাক্য আর সিদ্ধান্ত দিয়ে ভাগ করে লেখা যায় তাহলে চেয়ারম্যানের যুক্তি দাঁড়াবে এমন–

> কৃষকের বাবা ছিল ভিক্ষুক [আশ্রয় বাক্য]
>
> অতএব কৃষিকাজ সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দেওয়া তার ঠিক না [সিদ্ধান্ত]

একেবারেই ভুয়া যুক্তি, তাই না? তার বাবা কে ছিল সেটা কিন্তু এখানে মোটেই কোনো জরুরি ব্যাপার না। সে একজন কৃষক, তার ফসল সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতেই পারে। এই জায়গায় অযথা বাবাকে টেনে এনে চেয়ারম্যান সাহেব যেটা করলেন, সেটা হলো অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ। এটা Ad hominem-এর একটা উদাহরণ।

আর একটা উদাহরণ চিন্তা করো।

উদাহরণ ৩.২: মনে করো, একজন মা তার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে গেছে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে। সেই ডাক্তার একজন পুরুষ। ডাক্তার বাচ্চাটাকে দেখে কিছু পরামর্শ দিলেন। পরামর্শটা মায়ের পছন্দ হলো না। সেই মা এখন বলছে, আপনি তো একজন পুরুষ। আপনি কোনো দিন মা হবেন না। বাচ্চার কী করলে ভালো হয়, সেটা আপনি কোনো দিন বুঝবেন না।

মায়ের যুক্তিটা এমন—

> শিশু ডাক্তার একজন পুরুষ [আশ্রয় বাক্য]
>
> পুরুষদের পক্ষে মা হওয়া সম্ভব না [আশ্রয় বাক্য]
>
> সন্তানের ভালো শুধু মায়েরাই জানে [আশ্রয় বাক্য].
>
> সুতরাং কী করলে সন্তানের ভালো হবে শিশু ডাক্তার জানে না [সিদ্ধান্ত]

উঁহু, এই মায়ের যুক্তিও ঠিক হলো না। পুরুষ হওয়ার সঙ্গে বাচ্চার চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয় না বোঝার সম্পর্ক নেই। বলাই হচ্ছে, ওই চিকিৎসক একজন শিশু বিশেষজ্ঞ।

রাজনীতিতেও এ রকমের ফ্যালাসি আমরা প্রায়ই দেখে থাকি।

উদাহরণ ৩.৩: মনে করো নির্বাচনে দুইজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন। একজন প্রার্থী তার নির্বাচনী বক্তব্য দেওয়ার সময় অন্য প্রার্থী সম্পর্কে বলেছেন, আপনারা দেখেন ওই প্রার্থী ঠিকমতো দুই লাইন কথাই বলতে পারে না, হাঁটতে গেলে উষ্টা খায়, সে নাকি জনগণের উন্নয়ন করবে।

কথা বলতে পারার, হাঁটার সঙ্গে উন্নয়নকাজের সরাসরি সম্পর্ক নেই। তাই এই প্রার্থী যেটা করলেন, সেটা হলো অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আক্রমণ।

এটা বলার পরপরই হাসিব পেছন থেকে হাসির আওয়াজ পায়। পেছন হেকে একজন বলে, 'স্যার, হাফিজ একটা নিয়ে এটা ছড়া লিখে ফেলেছে।'

‘তাই নাকি?’ মজা পায় হাসিব। ‘বেশ শোনাও তাহলে—’

হাফিজ একটু লজ্জা পাওয়ার ভাব নিয়ে বলে,

> বললে কথা লোকে, সেই কথায় নজর দাও!
> কথা রেখে কেন শুধুই লোকটারে খোঁচাও?

ক্লাসের সবাই হাসে। ইঙ্গিতে হাফিজকে বসতে বলে হাসিব, ‘বাহ। হ্যাঁ, অনেকটা অমনই।’

সতর্কতা

তবে একটা ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করে দিতে চাই। ব্যক্তি আক্রমণ যে করা যাবে না, এটাই কিন্তু সব সময় সত্যি নয়। যদি আক্রমণটা

বললেন, 'তুই যে পরশুদিন তোর চাচার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলি, ওইটা ঠিক ছিল?'



এই ধরনের কথা কিন্তু প্রায়ই শোনা যায়। তবে এখানে কিন্তু একটা যুক্তির ভ্রান্তি আছে। খেয়াল করে দেখো, এখানে মূল যে প্রসঙ্গটা ছিল, বড় ভাইকে যে বলা হলো যে সে ঠিক করেছে কি না, সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু ঘুরে গেল। সেই প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা কিন্তু হারিয়ে গেছে।

বড় ভাইকে যখন বলা হলো যে আপনি যে অমুকের সঙ্গে জিনিসটা করলেন, কাজটা কি ঠিক হলো? সে তখন হয়তো বলতে পারত, আসলেই আমি এইটা ভুল করে ফেলেছি। অথবা সে বলতে পারত, না, ওই লোক কয়দিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছিল কিংবা ওই বয়স্ক লোকটাই হয়তো একটা অযৌক্তিক বা অনৈতিক কাজ করছিল, তার কারণেই আমি তাকে রুখে দাঁড়িয়েছি। এগুলো হতো প্রাসঙ্গিক কথা। কিন্তু সে প্রসঙ্গটাকে প্রশ্নকারীর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ছোট ভাই ঠিক করল কি করল না, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। তার ঠিক-বেঠিকে বড় ভাইয়ের ঠিক-বেঠিক কিছু আসে-যায় না।

উদাহরণ ৩.৫: এই ফ্যালাসিটাকে আরেকটু ভালো করে বোঝা যাবে একটা মজার উদাহরণ দিলে। মনে করো, আদালতে বিচারকের

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অপরাধী। তাকে জেরা করা হচ্ছে। অপরাধী একপর্যায়ে বলল, 'উকিল সাহেব, আপনিও তো ছোটবেলায় ছোট ছোট চুরি করেছেন, আর আমি করলেই দোষ?'

খেয়াল করো, এটা বললে কিন্তু অপরাধী কখনোই অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না। অর্থাৎ অন্যে কী দোষ করল সেই দোষ ধরিয়ে দিলে তার নিজের দোষ কিন্তু মাফ হয়ে যায় না। এখানে মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে তার অপরাধ।

আরও কয়েকটা উদাহরণ চিন্তা করো।

উদাহরণ ৩.৬: মনে করো, মা তার বাচ্চাকে ডেকে বলল, বাবা, তোর ঘরটা কিন্তু খুব অগোছালো হয়ে আছে, একটু গুছিয়ে রাখ। ছেলেটা তখন বলল, 'মা, তোমার ঘরও তো খুবই অগোছালো, তাহলে আমি তোমার কথা কেন শুনব?'

মায়ের ঘর অগোছালো থাকলেই তার নিজের ঘর অগোছালো থাকাটা যুক্তিযুক্ত হয়ে যায় না।

উদাহরণ ৩.৭: এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে যে দেখ দোস্ত, আমার মনে হয় সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তখন অন্যজন বলল, 'তুই নিজেই তো বিড়িখোর, এখন সিগারেটের বিরুদ্ধে কেন কথা বলিস।'

কথা আর কাজের অমিল থাকলে সেটাকে হিপোক্রেসি বলা যায়, সেই অর্থে প্রথম বন্ধু হয়তো হিপোক্রেসি-দোষে দুষ্ট। কিন্তু যুক্তির বিবেচনায় দ্বিতীয় বন্ধু যেটা করেছে, সেটা ভুল। কারণ, সে মূল যে বিষয় ছিল 'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর', সেই বিষয়টা নিয়ে কথা না বলে আক্রমণ করেছে বন্ধুটিকে।

যেহেতু এই ফ্যালাসিতে প্রায়ই অন্যের হিপোক্রিসিকে ধরিয়ে দিয়ে তার বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এ জন্য এই ফ্যালাসিকে 'Appeal to hipocrisy'ও বলা হয়।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অপরাধী। তাকে জেরা করা হচ্ছে। অপরাধী একপর্যায়ে বলল, 'উকিল সাহেব, আপনিও তো ছোটবেলায় ছোট ছোট চুরি করেছেন, আর আমি করলেই দোষ?'

খেয়াল করো, এটা বললে কিন্তু অপরাধী কখনোই অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না। অর্থাৎ অন্যে কী দোষ করল সেই দোষ ধরিয়ে দিলে তার নিজের দোষ কিন্তু মাফ হয়ে যায় না। এখানে মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে তার অপরাধ।

আরও কয়েকটা উদাহরণ চিন্তা করো।

উদাহরণ ৩.৬: মনে করো, মা তার বাচ্চাকে ডেকে বলল, বাবা, তোর ঘরটা কিন্তু খুব অগোছালো হয়ে আছে, একটু গুছিয়ে রাখ। ছেলেটা তখন বলল, 'মা, তোমার ঘরও তো খুবই অগোছালো, তাহলে আমি তোমার কথা কেন শুনব?'

মায়ের ঘর অগোছালো থাকলেই তার নিজের ঘর অগোছালো থাকাটা যুক্তিযুক্ত হয়ে যায় না।

উদাহরণ ৩.৭: এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে যে দেখ দোস্ত, আমার মনে হয় সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তখন অন্যজন বলল, 'তুই নিজেই তো বিড়িখোর, এখন সিগারেটের বিরুদ্ধে কেন কথা বলিস।'

কথা আর কাজের অমিল থাকলে সেটাকে হিপোক্রেসি বলা যায়. সেই অর্থে প্রথম বন্ধু হয়তো হিপোক্রেসি-দোষে দুষ্ট। কিন্তু যুক্তির বিবেচনায় দ্বিতীয় বন্ধু যেটা করেছে, সেটা ভুল। কারণ, সে মূল যে বিষয় ছিল 'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর', সেই বিষয়টা নিয়ে কথা না বলে আক্রমণ করেছে বন্ধুটিকে।

যেহেতু এই ফ্যালাসিতে প্রায়ই অন্যের হিপোক্রিসিকে ধরিয়ে দিয়ে তার বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এ জন্য এই ফ্যালাসিকে 'Appeal to hipocrisy'ও বলা হয়।

এমন আরও একটা উদাহরণ বলি।

উদাহরণ ৩.৮: মনে করো, একজন সেলিব্রেটি। তিনি মানুষকে সচেতন করতে চান বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ব্যাপারে। তিনি তার এক বক্তৃতায় বলেন, আমাদের সবাইকেই সচেতন হওয়া উচিত গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। এবার একজন মন্তব্য করল, 'আপনি নিজেই তো বিরাট বড় গাড়ি চালান, আপনি নিজেই তো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

খেয়াল করো, এখানে মূল বক্তব্য ছিল উষ্ণায়ন, এটা পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর। সেই কথা নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা হলো না। এখানে আক্রমণের শিকার হলো প্রথম ব্যক্তি, সেই সেলিব্রেটি। আর মূল প্রসঙ্গ থেকে আলোচনা দূরে সরে গেল।

আর আগে যেমন বলেছিলাম যে একজনের কথা ও কাজে যদি মিল না থাকে, সেটাকে আমরা বলি হিপোক্রেসি। এখানেও হয়তো সেই সেলিব্রেটি হিপোক্রেসি দোষে দুষ্ট কিন্তু তিনি হিপোক্রেট হলেও তার বক্তব্য কিন্তু অযৌক্তিক হয়ে যায় না। যখন আমরা যুক্তির কথা বলি, তখন এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখাটা জরুরি।

ক্লাসের পেছনে আবারও হাসির শব্দ। হাসিব জিজ্ঞেস করে, 'কী, হাফিজ কি আবারও ছড়াটড়া লিখেছ নাকি? লিখলে শোনাও।'

হাফিজ দাঁড়িয়ে বলে,

'তুইও এমন'– এইটা কইলে বুইঝ্যে শুইন্যে কোস
অন্যের দোষ ধরলে পরেই– কাটে না নিজের দোষ

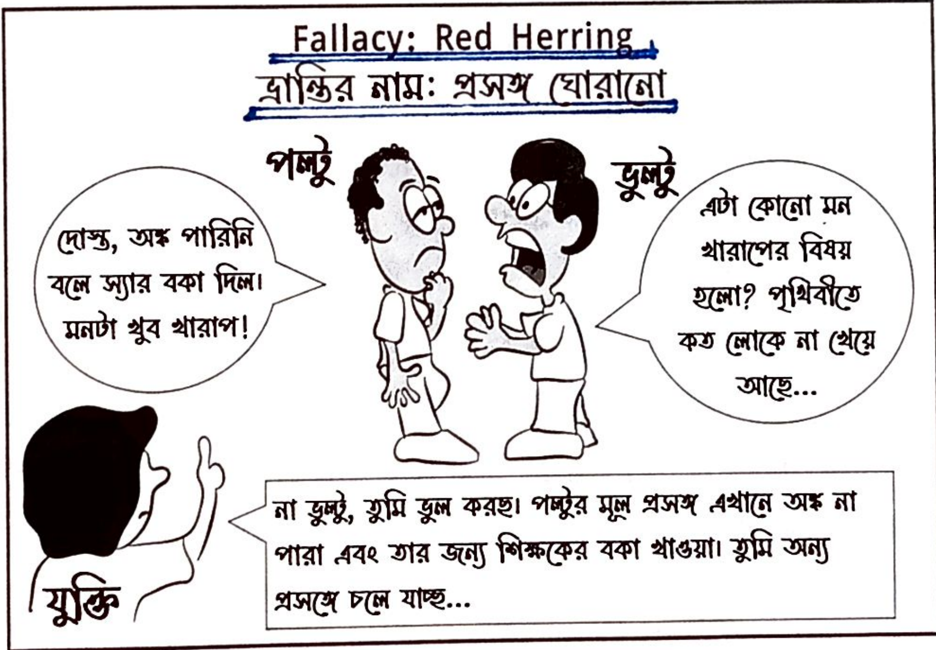
হ্যাঁ। একদম ঠিক কথা!

এবার আমরা আরেকটা ফ্যালাসি সম্পর্কে জানব। আগের দুটোতে আমরা দেখেছি কী করে মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কোনো মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছে। এবার দেখব প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার ভ্রান্তি।

ভ্রান্তির নাম RED HERRING– প্রসঙ্গ ঘোরানো

এটা হচ্ছে কথা ঘোরানোর খেলা। এটা যে রকম বিভ্রান্তির মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি এটা সাহিত্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। মনে করো, রোমাঞ্চকর একটা থ্রিলার পড়ছ। এমনসব থ্রিলারে প্রায়ই দেখবে, সাহিত্যিক চেষ্টা করেন মূল যে অপরাধী তাকে একটু লুকিয়ে রাখতে। অন্য একজনকে তিনি অপরাধী হিসেবে মনে করাতে চান। এরপর পাঠক শেষে গিয়ে টের পায় আসল অপরাধীটা কে। এই যে সব সময় লেখক চেষ্টা করছেন যে মূল অপরাধী তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, তিনি আসলে রেড হেরিং ব্যবহার করছেন। এই নামটা কোত্থেকে এল, সেটা আমি পরবর্তী সময়ে বোঝাব, তবে এখন কীভাবে কুযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়, সেটা তোমাদের একটু শেখানো যাক।

একটা উদাহরণ চিন্তা করো।



উদাহরণ ৩.৯: মনে করো, একটা বাচ্চা মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সে দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল যে একটা খুব সুন্দর খেলনা। এটা দেখে সে তার মাকে বলল, মা, আমাকে খেলনা কিনে দাও না। সেটা শুনে তার মা বলল, তাড়াতাড়ি বাসায় চলো, আমি মজার মজার খাবার রান্না করেছি।

এখানে খেয়াল করো, মা যে কাজটা করল, সেটা হলো কথাটা ঘুরিয়ে দিল। এটা একটা রেড হেরিংয়ের উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ চিন্তা করা যাক।

উদাহরণ ৩.১০: মনে করো, টোনাটুনির সংসারে বউটা তার স্বামীকে বলছে, তোমার না কথা ছিল এই কাজটা করে ফেলার। কী করলে তুমি?

স্বামী তখন বলল, দেখো, তোমার জন্য আমি একটা দারুণ ছবি আঁকছি। সুন্দর না?

খেয়াল করো, যেই কাজটার কথা বউ জানতে চাইছে, সেটার কোনো হদিস কিন্তু পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে অন্য একটা প্রসঙ্গ টেনে স্বামী ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেল।

আবার একটা উদাহরণ ভাবো।

উদাহরণ ৩.১১: ধরো, একটা মেয়ে এসে বলল যে মা, আজকে আমার মনটা খুব খারাপ, আমার স্কুলের স্যার আমাকে বকা দিয়েছেন। মা বলল, দেখ, মন খারাপ করার আরও অনেক বিষয় আছে। পৃথিবীতে প্রতিদিন না খেয়ে এত মানুষ মারা যাচ্ছে, এ বিষয়গুলো নিয়ে তুই মন খারাপ করতে পারিস।

দেখো, এখানে মূল প্রসঙ্গটা কী ছিল? প্রসঙ্গ ছিল যে সে একটা পড়া পারেনি, সে জন্য স্যার বকা দিয়েছেন। মা এখানে বলতে পারে যে তুই ঠিকমতো লেখাপড়া কর, তাহলে আর বকবেন না। কিংবা বলতে পারে কোনো অসুবিধা নেই, আমিও একসময় বকা খেয়েছি। তুই চেষ্টা করলে তুইও পারবি। এভাবে অনেকভাবেই বাচ্চাটাকে বোঝাতে পারো। তার মানে এই না যে কতজন মানুষ পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত আছে, তাদের কথা চিন্তা করে পড়ালেখার কথা ভুলে যেতে হবে।

এই মূল বক্তব্যটাকে পুরোপুরি অন্য খাতে প্রবাহিত করে ফেলা হলো

উদাহরণ ৩.১২: মনে করো, একটা জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। নিরাপদ সড়ক চাই। এবার অন্য একজন বলল, 'এখন তারা সড়ক নিয়ে আন্দোলন করছে কিন্তু যখন স্কুলে দুর্নীতি হয়েছিল, সেই দুর্নীতি নিয়ে তারা কেন আন্দোলন করল না?'

এখানেও কিন্তু রেড হেরিং। প্রসঙ্গ নিরাপদ সড়ক। সেখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো, তারা একরকমের মিল খুঁজে পায়। দুটোই তো পড়াশোনাসংক্রান্ত, তাহলে মনে হয় যুক্তিটা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আদতে দুটো আলাদা বিষয়। একটার ওপর আরেকটার কোনো নির্ভরশীলতা নেই।

'তখন উনি কই ছিলেন বা তখন তারা কই ছিল', এই ধরনের কথা যখন শুনবে, তখনই খেয়াল করবে, আদতেই দুটোর মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক আছে কি না।

উদাহরণ ৩.১৩: ধরো, কেউ একজন অনলাইনে ইংরেজি পড়ায়, সেখানে কেউ মন্তব্য করল, খালি ইংরেজি পড়ালে হবে, গণতন্ত্রের কথা ভাবতে হবে না! এটাও রেড হেরিং। এখানে ইঙ্গিতটা এমন যে সে ইংরেজি পড়ালে গণতন্ত্রের জন্য সময় ব্যয় করা যায় না। আদতে এই দুটো ঘটনার মধ্যে এমন কোনো নির্ভরশীলতা নেই।

তোমরা হয়তো খেয়াল করবে রাজনীতিবিদেরা প্রায়ই রেড হেরিং ব্যবহার করেন তাদের বক্তব্যে।

উদাহরণ ৩.১৪: ধরো, একজন সাংবাদিক একজন রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার অফিসে যে দুর্নীতির খবর পাওয়া গেল, সে ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন?' রাজনীতিবিদ উত্তর দিলেন, 'আমি সব সময় সাধারণ মানুষকে নিশ্চিত করতে চাই যে আমি যা করি মানুষের ভালোর জন্য করি। আমি সব সময় মানুষের ভালোটার কথা সবার আগে চিন্তা করি। আমরা কয়দিন আগে যে নতুন একটা বিল পাস করলাম, সেটা গণমানুষের কথা ভেবেই পাস করেছি।'

খেয়াল করো, মূল যে প্রশ্নটা ছিল সেই দুর্নীতির প্রসঙ্গটা কিন্তু রাজনীতিবিদের বক্তব্যে গায়েব হয়ে গেছে।

হাসিব টানা ফ্যালাসিগুলো বলে থামল। এবার এনাম জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, এটার নাম Red Herring কেন হলো?'

'হেরিং আসলে একরকমের মাছ। আমাদের ইলিশ মাছও এক জাতের হেরিং। যদিও Red Herring শুনলে মনে হয় লাল রঙের হেরিং মাছ, আসলে হেরিং কখনো লাল হয় না। হেরিং মাছকে ধোঁয়া দিয়ে ভাপ দিয়ে রান্না করলে এর ভেতরটা লাল হয়ে যায়। তখন আমাদের শুঁটকি মাছে যেমন গন্ধ থাকে, অমন একটা গন্ধ হয় মাছটাতে।

এবার এই গন্ধ মাছটা ব্যবহার করা হয় শিকারি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এটার মূল কাজ গন্ধ দিয়ে কুকুরটাকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। মনে করো, কুকুরটাকে শিয়াল ধরার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিয়ালের গন্ধ প্রথমে চেনানো হয়। তারপর যে পথে শিয়াল গেছে ওই পথে লাল হেরিং ফেলে রাখা হয়। হেরিংয়ের গন্ধটা অনেক তীব্র হওয়ায় কুকুরটা প্রথম প্রথম বিভ্রান্ত হয়ে যায়। পরে একসময় প্রশিক্ষণ নিতে নিতে সে আলাদা করে বুঝতে পারে শিয়ালের গন্ধটা।

এই যে অন্য গন্ধ দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া, সেখান থেকেই এসেছে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা।

সবাই মাথা নাড়ে।

হাসিব বলে, বেশ!

তারপর হাফিজের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী কবি, রেড হেরিং নিয়ে দুই লাইন হবে নাকি?'

হাফিজ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকায়, তারপর হেসে বলে,

> কী বললাম আমি, আর সে গেল কোনখানে!
> বুঝদার লোক ঠিকই বোঝে কথা ঘোরানোর মানে

বাহ্। তুমি কি দাঁড়িয়েই বানিয়ে ফেললে? হাফিজ লজ্জা পায়।

ক্লাস সেদিনের মতো ওই পর্যন্তই রইল। হাসিব জানিয়ে গেল, পরের ক্লাসে আরও কয়েকটা ফ্যালাসি নিয়ে কথা বলা যাবে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে কেউ একজন বলল, 'স্যার, এই যে অঙ্কের ক্লাসে অঙ্ক বাদ দিয়ে যুক্তিবিদ্যা শেখাচ্ছেন, এটাও কি রেড হেরিং?'

হাসিব ভ্রু কুঁচকে কিছু একটা ভাবল। তারপর টিচার্স রুমের দিকে হাঁটা দিল।

বক্তব্যকে কি নিজের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করছ

আগের দিনের মতোই হাসিব ক্লাসে ঢুকল কয়েকটা কাগজের নোট নিয়ে। সেখান থেকে একটা নোটের দিকে তাকিয়ে হাসিব বলল, আজকে তোমাদের এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলব, যেটা আমাদের চারপাশে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। আমরা প্রায়ই যুক্তি দিতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফেলি। সেখান থেকেই এই ধরনের ফ্যালাসি বা বিভ্রান্তিগুলো তৈরি হয়। আজকে কয়েক রকমের ফ্যালাসি তোমাদের শেখাব।

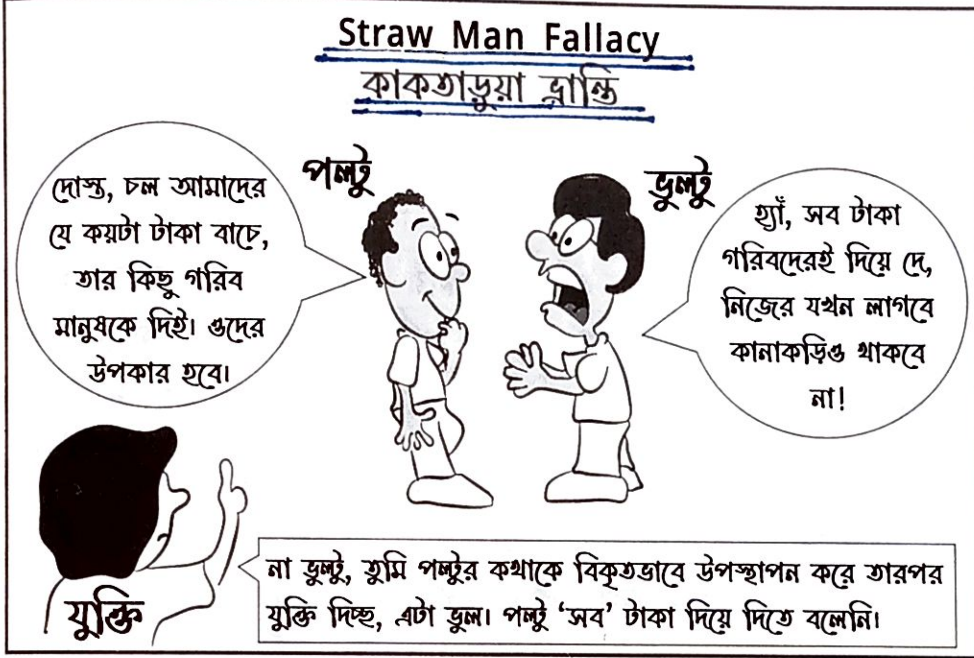
এগুলোর ভেতরে একটা মিল আছে। বিষয়বস্তুকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে নেওয়া হয় সবগুলোতে। চলো প্রথমটাতে যাওয়া যাক– এটার নাম– Straw man fallacy বা কাকতাড়ুয়া বিভ্রান্তি।

ভ্রান্তির নাম STRAW MAN FALLACY– কাকতাড়ুয়া ভ্রান্তি

হাসিব বলল, এই ভ্রান্তিটা খুব মজার। এখানে যা হয় তা হলো, অন্য কারও কথাকে নিজের মতো করে ঘুরিয়ে-সাজিয়ে অথবা বিকৃত করে বলা হয় যেন আক্রমণ করা সহজ হয়। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

উদাহরণ ৪.১: মনে করো, ময়না আর খবিস দুই বন্ধু। ওদের বাসা পাশাপাশি। দুজন একসঙ্গে স্কুলে আসে। একদিন খবিস গিয়ে ময়নাকে ডাকল, 'কিরে ময়না, তুই স্কুলে যাবি না?' ময়না বাইরে এসে দুর্বল

গলায় বলল, 'দোস্ত, আমার দুই দিন ধরে জ্বর, মাথাব্যথা। এখন যদিও জ্বর নেই, শরীরটা খুব দুর্বল। এই অবস্থায় স্কুলের কথা ভাবতেই পারছি না।'



'আচ্ছা', বলে খবিস চলে গেল। স্কুলে ময়নাকে না দেখে স্যার খবিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, তোর দোস্ত আজকে আসেনি কেন?'

'স্যার, ও আসেনি, কারণ ওর নাকি স্কুলের কথা ভাবতেই ইচ্ছা করে না।'

খেয়াল করো, ময়নার না আসার যে মূল কারণ, ও যে অসুস্থ, সেটা কিন্তু খবিস বেমালুম চেপে গেল। এখন যে অবস্থা দাঁড়াল, সেটা শুনলে শিক্ষক খেপে যেতেই পারেন।

এখানে খবিস যে কথাটা বলেছে, সেখানে একটা ভ্রান্তি হয়েছে, ওর বক্তব্যটাকে বলা যায় এমন করে,

> ময়নার স্কুলের কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না (আশ্রয় বাক্য)
>
> তাই সে স্কুলে আসে নাই [সিদ্ধান্ত]

এখানে আশ্রয় বাক্যটা কিন্তু বিকৃত। ময়না বলেনি যে তার স্কুলের কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না।

ক্লাসে ফার্স্টবয় এনাম জিজ্ঞেস করল, 'এটাকে Strawman কেন বলল?'

'এটাকে এভাবে ভাবতে পারো। মানুষ নিয়ে কথা বলার কথা, তুমি বললে কাকতাড়ুয়া নিয়ে। অর্থাৎ মানুষের একটা বিকৃত রূপকে তুমি আক্রমণ করলে। চলো আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক!

উদাহরণ ৪.২: শহরের ভেতরে মুদির দোকান। জরাজীর্ণ অবস্থা। ব্যবসা ভালো চলছে না। দোকানির ছেলে বাবাকে বলল, 'বাবা, আমার মনে হচ্ছে আমরা যদি লাভের কিছু টাকা দিয়ে দোকানটা একটু ঠিকঠাক করি, একটু প্রচারণা করি- ব্যবসা একটু ভালো হতে পারে।' এটা শুনে বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, যা লাভ হয় সব আমি দোকান রং করতেই ঢেলে দিই, তাহলে আর খেয়েপরে বাঁচতে হবে না।'

খেয়াল করো, এখানে বাবাটা কিন্তু Strawmanning করলেন। সব টাকা সংস্কারে দিলে তার সমস্যা হবে এটা ঠিক কথা। কিন্তু সব টাকা দিয়ে দিতে হবে, এমন কথা কিন্তু ছেলেটা বলেনি। বাবা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলেন যেন আক্রমণ করতে সুবিধা হয়।

কখনো কখনো নিজের মনগত একটা মানে দাঁড় করিয়ে সেটাকেও আক্রমণ করা হয়। সেটাও কাকতাড়ুয়া ভ্রান্তিতে পড়ে।

উদাহরণ ৪.৩: ধরো, কেউ একজন বলল, আমার মনে হয় আমরা পুলিশ-মিলিটারিতে যে খরচ করি, আরেকটু কম করলেও মনে হয় হতো। দ্বিতীয়জন বলল, 'হ্যাঁ, তুমি চাও আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা বলে কিছু না থাকুক, বাইরের দেশ এসে দখল করে নিয়ে যাক।'

এটাও স্ট্রম্যান। প্রথমজন অবাক হয়ে যাবে, 'এটা আমি কখন বললাম যে প্রতিরক্ষা বলে কিছুই না থাকুক!'

আবার মনে করো, কোনো মানুষ কথা বলতে বলতে ছোট একটা জায়গায় বেফাঁস কথা বলেছে। তার যুক্তিগুলো খুব ভালোই ছিল। সুন্দর সুন্দর যুক্তি দিয়ে সে কথা বলছিল। কিন্তু একটা জায়গায় বেফাঁস কথা বলেছে। তুমি এখন তার মূল বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ওই যে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে, সেটাকে ধরে আক্রমণ করলে।

তারপর বললে, যে এই ধরনের কথা বলতে পারে তার কোনো কথাই ঠিক না। এমন বলাটাও কিন্তু স্ট্রম্যান যুক্তির ভেতরে পড়বে।

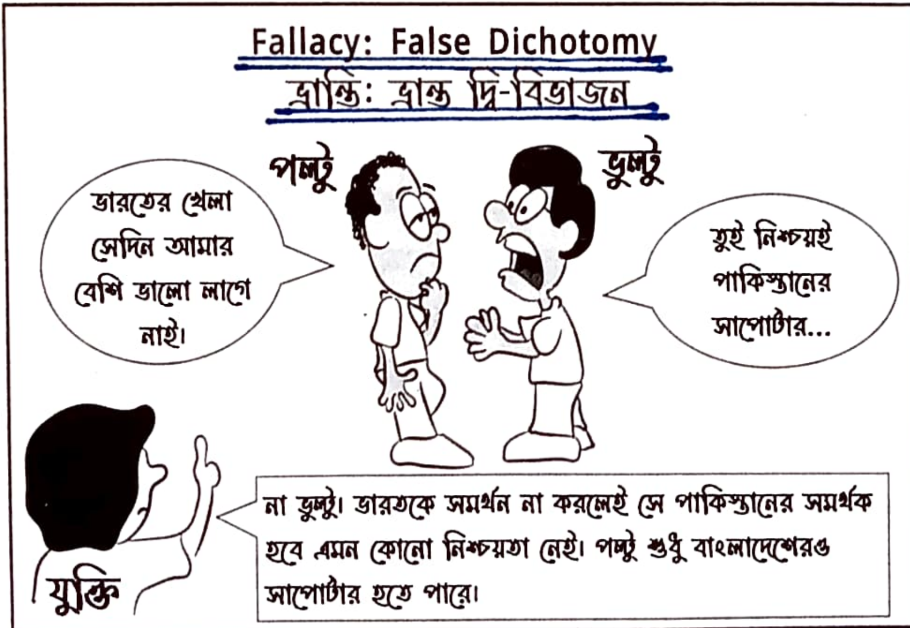
হাসিব এটুকু বলে ক্লাসের পেছনে তাকায়। হাফিজের দিকে চোখ পড়তেই সে উঠে দাঁড়ায় না বলতেই। বলে,

তাই বলে তুমি এমন করো তর্কে জেতার জন্য
এমন করেই বদলাও কথা মানে হয়ে যায় অন্য

হাসিব হাসে। হ্যাঁ, এমন করে বিকৃত করা যাবে না, যেন প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্যের একটা অন্য মানে দাঁড়া হয়ে যায়। এবার এমন বিকৃত করার আরেকটা কুযুক্তি নিয়ে বলা যাক, সেটাকে বলে False Dichotomy।

ভ্রান্তির নাম FALSE DICHOTOMY FALLACY–ভ্রান্ত দ্বি-বিভাজন

এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা হয় তা হলো, মানুষ সব রকমের অপশন বিবেচনা করে না। একটা না হলেই আরেকটা হবে এমন কিছু একটা ধরে নিয়ে যুক্তি দেয়। যেমন কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।



উদাহরণ ৪.৪: মনে করো, ফুটবল বিশ্বকাপ চলছে। বাসের ভেতরে একজন যাত্রী আর্জেন্টিনার খুব গুণকীর্তন করছিল। শুনে পাশের একজন বলল, 'ভাই, এখনো আর্জেন্টিনাকে কীভাবে সাপোর্ট করেন? ওরা তো বিশ্বকাপ জিততেই পারে না।' শুনে প্রথমজন বললেন, 'আর্জেন্টিনা কী, এটা আপনারা ব্রাজিলের সাপোর্টাররা জিন্দেগিতেও বুঝবেন না।'

এখানে একটা ভুল হয়েছে। কেউ কি বলতে পারবে ভুলটা কী?

মিলা বলল, 'স্যার, পাশেরজন যে ব্রাজিলেরই সাপোর্টার, এটা সে কীভাবে বলল?'

ঠিক তাই! একজন আর্জেন্টিনাকে সমর্থন না করলেই সে ব্রাজিলের সাপোর্টার, এটা কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। জার্মানি, ইতালি, ইংল্যান্ড আরও কত দল আছে, তাই না?

Dichotomy মানে হলো দুই ভাগে বিভক্ত। False Dichotomy মানে হলো আসলে দুই ভাগে বিভক্ত না, আরও অপশন আছে, কিন্তু মানুষ অনুমান করে নিচ্ছে যে দুই ভাগেই বিভক্ত। তারপর সেটা ভেবে নিয়ে আক্রমণ করছে।

উদাহরণ ৪.৫: তুই যদি আমার দলকে সমর্থন না করিস, তাহলে তুই আসলে অন্য দলটাকে সমর্থন করিস।

বলো দেখি, ভুলটা কোথায়?

এনাম বলল, 'স্যার, এমনও তো হতে পারে, সে তৃতীয় আরেকটা দলকে সমর্থন করে।' সুজন বলল, 'আবার ধরেন, এমনও যদি হয় যে সেখানে দুইটাই মাত্র দল আছে, তখনো এই যুক্তি ঠিক না হতে পারে। এমন হতেই পারে যে, সে দুইটা দলের কোনোটাকেই সমর্থন করে না, দুইটার ওপরেই বিরক্ত।'

হাসিব মুগ্ধ হয়, 'চমৎকার। একেবারে ঠিক বলেছ তোমরা। তার মানে এই দুইটাই শুধু অপশন, ব্যাপারটা এমন নয়।'

এবার হাসিব বলে,

আগের উদাহরণটার সূত্র ধরে মনে পড়ল একটা প্রচলিত উক্তি, যেটা যুক্তির বিবেচনায় ভুল। সেটা হলো, 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু।'

উঁহু, এটা কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় না। এমন হতেই পারে যে শত্রুর যে শত্রু, সে অন্য দুজনকেই ঘৃণা করে।

উদাহরণ ৪.৬: উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হিটলারের কথা। আমি কিছু মুসলিমদের চিনি যারা মনে করে, ইহুদিরা তাদের শত্রু। তাদের ভেতরে কয়েকজনকে চিনি যারা মনে করে, যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ইহুদিদের মেরেছে, তাই হিটলার মুসলিমদের বন্ধু। অথচ হিটলারের লেখা থেকে জানা যায়, সে মুসলিমদের নিচু জাতের মনে করত। অর্থাৎ যুক্তিটা খাটছে না।

যা হোক, 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এমন অনেক উক্তি আসলে যুক্তির বিবেচনায় ধোপে টেকে না। আরেকটা এমন প্রচলিত উক্তির কথা বলি।

উদাহরণ ৪.৭: লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। তাই লেখাপড়া করা উচিত।

এটার ভেতরও একটা প্রচ্ছন্ন ডাইকোটমি আছে। এখানে লেখাপড়া করার যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, সেটা হলো গাড়িঘোড়া চড়া বা আরেকটু সহজ করে বললে বিত্ত অর্জন। এখন কেউ যদি সেটাতে আগ্রহী না হয়?

আরেকটা উদাহরণ বলি।

অনেক সময় Dichotomy-টা লুকানো থাকে।

উদাহরণ ৪.৮: একসময় আকাশে ফ্লাইং সসার দেখা যাচ্ছে– এ নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল বেশ। তখন অনেক মানুষের বক্তব্য ছিল এমন, বিজ্ঞানীরা পারলে ব্যাখ্যা করুক এই উড়ন্ত জিনিসগুলো কোত্থেকে এসেছে। ব্যাখ্যা না করতে পারলে মেনে নিক যে এটা এলিয়েনদের কাজ।

এখানেও মাত্র দুই রকমের অপশন নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। এক প্রকারের জিনিস হলো পৃথিবীর, সেগুলো বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে পারে আর আরেক প্রকার হলো পৃথিবীর বাইরের, যেটা বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

কিন্তু আসল ঘটনা হলো, এমন বহু কিছু আছে, যেটার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না। ব্যাখ্যা না করতে পারলেই সেটা পৃথিবীর বাইরের, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। Appeal to ignorance বলে একটা ফ্যালাসি আছে, যেটা এটার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা সেটার কথা পরে বলব।

এতক্ষণ তো শুধু দুই রকমের অপশন নিয়ে বললাম। কিন্তু এই ভ্রান্ত বিভাজন দুইয়ের বেশি অপশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। ধরো, কোথাও অনেক অপশন আছে, কিন্তু মানুষ এমনভাবে বলল যে তোমাকে তিনটের ভেতরেই একটাকে বেছে নিতে হবে, সেটাও কিন্তু False Dichotomy-রই আরেকটা রূপ।

হাসিব পেছনের সারিতে হাফিজের দিকে তাকায়, ‘কী কবি, দুটো লাইন হবে নাকি?’

হাফিজ স্বভাবকবি। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বলে,

এইটা না হলে ঐটাই হবে এমন বলার আগে
আর কী জিনিস হওয়া সম্ভব সেইটাও ভাবা লাগে

ঠিক তাই, কী কী হওয়া সম্ভব সবই চিন্তা করে তারপরে যুক্তি দিতে হয়। এবার আরেকটা যুক্তির কথা বলব, যেখানে বক্তা একটা উপমা ব্যবহার করেন, তারপর উপমাটা দিয়েই কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করেন। এটা খারাপ কিছু না, কিন্তু উপমাটা যুক্তিযুক্ত কি না, সেটাও খেয়াল রাখাটা দরকার।

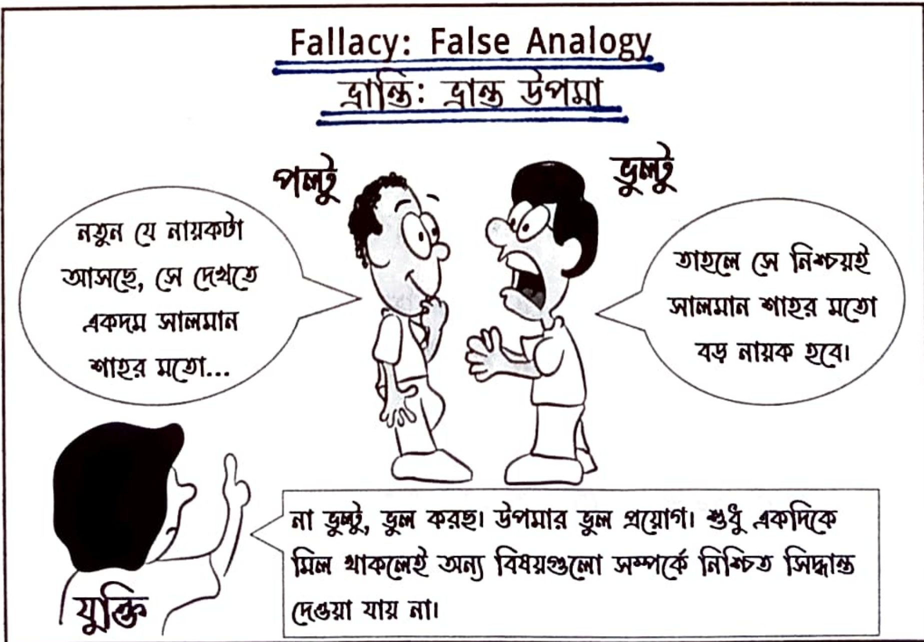
ভ্রান্তির নাম FALSE ANALOGY— ভ্রান্ত উপমা

একয়াত বিষয়ের উপমা আরেকটা দিয়ে দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হয় যে যেটা মূল সিদ্ধান্ত, সেটার জন্য উপমাটা প্রাসঙ্গিক কি না। একটা উদাহরণ দেখি চলো।

উদাহরণ ৪.৯: ধরো, কেউ একজন এভাবে যুক্তি দিচ্ছে—

> গাড়িতে চড়ার কারণে মানুষ মরে [আশ্রয় বাক্য]
>
> সিগারেট খেলেও মানুষ মরে [আশ্রয় বাক্য]
>
> সিগারেট খাওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে গাড়ি চড়াও নিষিদ্ধ করা উচিত [সিদ্ধান্ত]

এই উদাহরণের সমস্যা হলো— তুলনাটা অযৌক্তিক। প্রথমে শ্রোতাকে বোকা বানানোর জন্য একটা মিল দেখানো হয়েছে 'দুটোর কারণেই মানুষ মরে'। কিন্তু এই মিলটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না, সেটা বিচার করা জরুরি। অনেক ব্যাপার এখানে জড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ ভাবতে পারো, গাড়িতে চড়া বাদ দিয়ে দিলে সমাজ ও অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়বে, সিগারেট নিষিদ্ধ করলে প্রভাব কি একই হবে?



উদাহরণ ৪.১০: আবার ধরো, কেউ বলল শেয়ারবাজারে টাকা ঢালা আর লটারির টিকিট কেনা একই কথা। কারণ, পুরাটাই অনিশ্চয়তার খেলা।

এখানেও সমস্যা হলো, তুলনাটা অযৌক্তিক। লটারির টিকিট আর শেয়ারবাজার দুই জায়গাতে অনিশ্চয়তা আছে, তার মানেই দুটো এক নয়। লটারির টিকিটে নিজের বিচার-বুদ্ধি-ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ খুবই কম। সেখানে প্রায় পুরোটাই ভাগ্যের ওপরে। এভাবে ভাবো, পাঁচটা টিকিট থেকে আন্দাজে একটা তুলে নিলে অন্য টিকিটগুলোর থেকে জেতার সম্ভাবনা কমে যাবে না।

সে তুলনায় শেয়ারবাজার অনেক হিসাব-নিকাশের জায়গা। পাঁচটা শেয়ারের সুযোগ আছে, সেখান থেকে কেউ আন্দাজে একটা তুলে নিলে জেতার সম্ভাবনা একই থেকে যাবে, এমন বলা যায় না।

এমন আরও কয়েকটা উল্টোপাল্টা তুলনার উদাহরণ দিতে পারি।

উদাহরণ ৪.১১: চাল আর গম তো একই রকম দানা, দুটোই শর্করা। চাল দিয়ে রান্না করা বিরিয়ানি খেতে মজা। তাহলে গম দিয়ে রান্না করা বিরিয়ানিও মজা হবে।

শুধু দানা আর দুটোই শর্করা এই মিল থেকে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে দুটোই মজা হবে।

উদাহরণ ৪.১২: নতুন এক নায়ক এসেছে, দেখতে সালমান শাহের মতো। নিশ্চয়ই সে-ও বিরাট বড় নায়ক হবে।

আগেরবারের মতোই শুধু চেহারার মিল থেকে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, সে সালমান শাহের মতো বড় নায়ক হবে। সমস্যা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারো?

সুজন হাত তুলল, 'স্যার, আমার মনে হয় যেই সিদ্ধান্তটা আমরা নিতে চাচ্ছি, সেটার জন্য কী কী বিষয় দরকারি তার সবকিছু না দেখে শুধু একটা দিকে মিল পেলেই আমরা খুশি হয়ে যাচ্ছি। যেমন ধরেন, নায়ক হতে গেলে খালি তো চেহারা থাকলেই হয় না,

অভিনয়-দক্ষতা থাকতে হয়, তার অ্যাটিচিউড ঠিক থাকতে হয়, এমনকি দক্ষতার বাইরেরও বিষয় আছে। যেমন ধরেন, পরিচালকের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক থাকতে হয় ইত্যাদি। এখন শুধু চেহারায় মিল থাকলে আমরা কী করে নিশ্চিত হব যে সে সালমান শাহের মতো বড় নায়ক হবে?'

'ঠিক তাই!' উত্তর শুনে খুশি হয় হাসিব। হাসিব ক্লাসের পেছনে হাফিজের দিকে তাকায়। এটা একটা রেওয়াজের মতো হয়ে যাচ্ছে। হাফিজ দাঁড়ায়। ওর মুখে কিছুটা বিরক্তি মনে হলো। বলে,

কিসের সঙ্গে মেলাচ্ছ কী, মেলাও ধৈর্য ধরে
ভুল উপমায় অনেক কিছুই ঠিক লাগে ভুল করে

বাহ্, সুন্দর বলেছ। কিন্তু তুমি কি আরও কিছু বলতে চাও, হাফিজ?

'জি স্যার', হাফিজ বলে, 'আর ছড়া কাটব না, কবিদের গৎবাঁধা নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া যাবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বসো। তোমাকে আর অনুরোধ করব না!' হাসিবেরও একটু মন খারাপ হয়। প্রসঙ্গ ঘোরাতে এবার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে,

'এই False Analogy ফ্যালাসিটার মতো আরেকটা ফ্যালাসি আছে, যেখানে একই শব্দকে একবার উপমার অর্থে ব্যবহার করে আরেকবার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করে যুক্তি দেওয়া হয়। সেটাকে বলে Equivocation।'

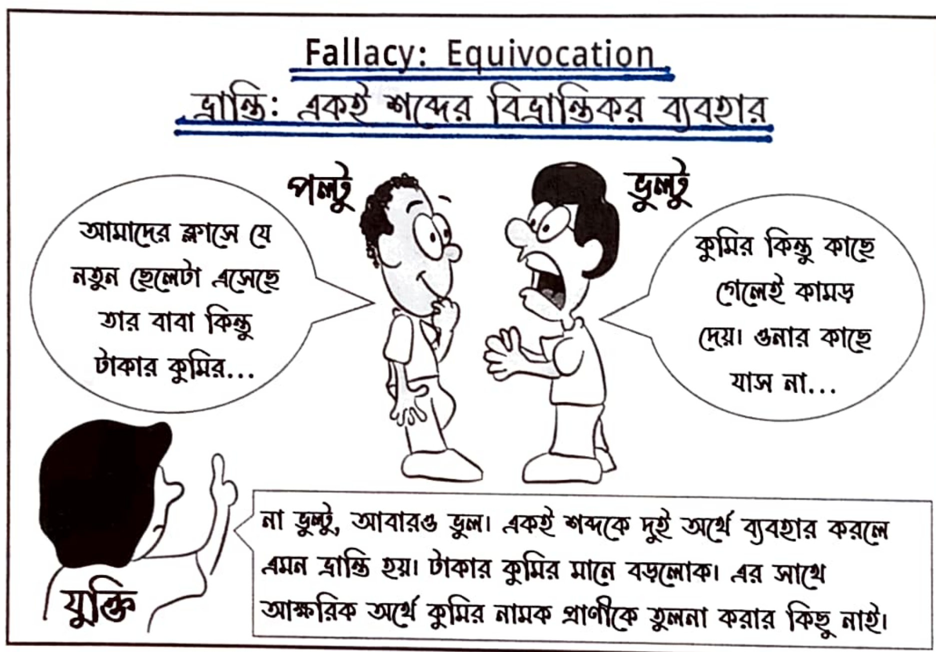
ভ্রান্তির নাম EQUIVOCATION– ভিন্ন অর্থে একই শব্দ ব্যবহারের ভ্রান্তি

একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

উদাহরণ ৪.১৩: রমিজ সাহেব এখন টাকার কুমির হয়েছেন। ওনার থেকে সাবধান থেকো, কুমির যেমন সুযোগ পেলেই কামড় দেয়, উনিও সুযোগ পেলেই তোমার ক্ষতি করবেন।

এখানে ঝামেলাটা হয়েছে কুমির শব্দটা নিয়ে। এমনিতে কুমির শুনলে একটা ভয়ংকর প্রাণীর চেহারা মাথায় আসে। কিন্তু টাকার কুমির অর্থ হলো ধনী ব্যক্তি, যার অনেক টাকা আছে। সে ভয়ংকর হবেই এমন কোনো কথা নেই। তাকে আক্ষরিক অর্থে কামড়ে দেওয়া কুমিরের সঙ্গে তুলনা করা অযৌক্তিক।

উদাহরণ ৪.১৪: বাচ্চাদের কাদামাটির মন। কাদামাটি আগুনে পুড়িয়ে ইট বানাতে হয়। তাই বাচ্চাদের একটু কষ্ট দিলে খারাপ না, মন শক্ত হবে।



এখানে কাদামাটি শব্দটার যাচ্ছেতাই ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের মন কাদামাটির বলার মানে হলো, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মনটাকে নানা আকার দেওয়া যায়। এটাকে আক্ষরিক কাদামাটি ধরে তাকে পোড়ানোর চিন্তা উপমার ভুল প্রয়োগ। একই সঙ্গে ভ্রান্ত উপমা এবং শব্দ-বিভ্রান্তির উদাহরণ এটা।

শব্দ-বিভ্রান্তির কথা বলতে গিয়ে একটা প্রবাদের কথা মাথায় এল, 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'। অনেক সময় বক্তা আশ্রয় বাক্যটাকেই একটু ঘুরিয়ে সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। এটাকে বলে চক্রীয় যুক্তি 'circular reasoning'। এটাকে Begging the question-ও বলে।

চলো, সেটা একটু দেখে আসি।

ভ্রান্তির নাম BEGGING THE QUESTION/ CIRCULAR REASONING– চক্রাকার যুক্তি

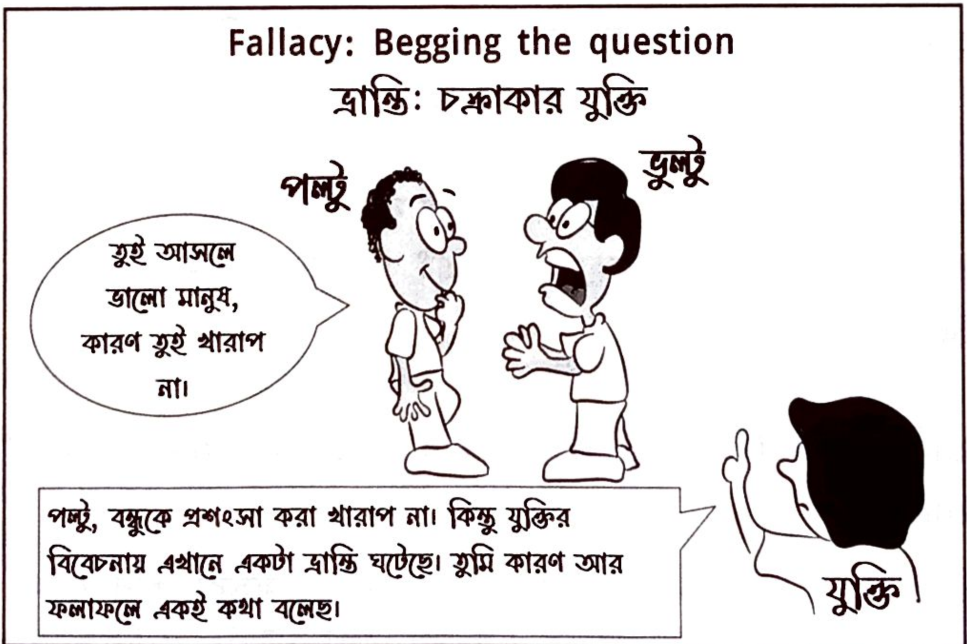
এই ধরনের ভ্রান্তির মূল কাঠামো খুব সহজ: 'এটা সত্যি, কারণ এটা সত্যি।' একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝাই।

উদাহরণ ৪.১৫: মনে করো, একজন মানুষ বক্তব্য দিচ্ছে, 'আমরা সবচেয়ে ভালো যে কাজটা করতে পারি তা হলো, একে অন্যকে ভালোবাসতে পারি। কারণ, ভালোবাসার চেয়ে ভালো কিছু আর নেই।'

রিতা হেসে বলল, 'স্যার, শুনতে তো ভালোই লাগছে। সমস্যা কোথায়?'

হাসিব এনামের দিকে তাকায়। এনাম বলে, 'আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছি। যেটাকে সে ধরে নিয়েছে, যেটা তার আশ্রয় বাক্য, সেটাই তার সিদ্ধান্ত।'

হ্যাঁ, হাসিব বলে, আসলে এখানে একই কথা দুইবার ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। একটা আরেকটার কারণ নয়। এমন করে একটা উক্তি চিন্তা করো,



উদাহরণ ৪.১৬: পটোলবাবু একজন সত্যবাদী মানুষ। কারণ, তিনি সব সময় সত্যি কথা বলেন।

এখানেও দেখো আসলে একই কথা দুইবার বলা হয়েছে। একইভাবে,

উদাহরণ ৪.১৭: কথা বলার স্বাধীনতা খুব জরুরি, কারণ মানুষকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া উচিত।

আশা করছি বুঝতে পারছ এখানে সমস্যাটা কোথায়? সব সময় কিন্তু এই চক্রাকার যুক্তি এত সরল-সোজা হয় না। অনেক সময় ব্যাপারটা বেশ ঘুরিয়ে হয়। একটা চক্রের মতো। উদাহরণ দিই।

> একুল একজন সত্যবাদী। কারণ, বিকুল বলেছে সে সত্যবাদী।
>
> বিকুল যে সত্যবাদী সেটা কী করে জানো? কারণ, সিকুল বলেছে, বিকুল সত্যবাদী।
>
> সিকুল যে সত্যবাদী সেটাই-বা কী করে জানো? কারণ, ডিকুল বলেছে, সিকুল সত্যবাদী। ডিকুল যে সত্যবাদী, সেটা কী করে জানো? কারণ, একুল বলেছে, ডিকুল সত্যবাদী।

খেয়াল করে দেখো, একটা চক্র শেষ হয়েছে এখানে। নিজেরাই নিজেদের সত্যায়ন করছে। এখান থেকে একুল সত্যবাদী কি না, তা কোনোভাবেই প্রমাণ হয় না।

খেয়াল করে দেখবে, এখন পর্যন্ত যে ফ্যালাসিগুলো নিয়ে বলেছি সব জায়গাতেই বক্তা অন্যকে যুক্তিতে হারানোর জন্য কথাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন– কখনো ভুল উপমা দিয়ে, শব্দকে কৌশলে ব্যবহার করে। এবার আজকের শেষ যে ফ্যালাসিটা বলব সেটা হলো, হার না মেনে নেওয়ার ফ্যালাসি। এই ফ্যালাসির নাম No True Scotmans` প্রকৃত বাঙালি ভ্রান্তি।

ভ্রান্তির নাম NO TRUE SCOTMANS– প্রকৃত বাঙালি ভ্রান্তি

ধরো, কেউ একটা বিষয় নিয়ে ঢালাও একটা মন্তব্য করে বসল। তাকে ভুল ধরিয়ে দেওয়া হলো উল্টো একটা উদাহরণ দিয়ে। সে তখন নিজের ভুল স্বীকার না করে বলল, ‘ওরা আমার হিসাবের মধ্যে নেই, ও বাদে বাকিদের জন্য আমার কথা সত্য।’

উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে।

উদাহরণ ৪.১৮: ধরো, কেউ একজন নেতা গর্ব করে বলল, 'কোনো বাঙালি কোনো দিন চুরি করে না।' পাশ থেকে একজন বলল, 'স্যার, ওমুকচোরা তো বিখ্যাত চোর, সেও তো বাঙালি।' নেতা এবার বলল, 'উঁহু, সে প্রকৃত বাঙালি না। কোনো প্রকৃত বাঙালি কোনো দিন চুরি করে না।'

এই 'প্রকৃত' কথাটা বলে সে তার আগের অবস্থানকে সুবিধামতো বদলে নিল।

No True Scotmans ফ্যালাসিতে এমন ব্যাপারই বারবার দেখা যায়। নেতা যখন ঢালাওভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, তখন একজন উল্টো উদাহরণ দিয়েছেন। ফলে তার বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি তার বক্তব্যকে কায়দা করে বদলে নিলেন।

সমস্যা হলো, বাঙালি কী জিনিস সেটা ভাষা দিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না করতে পারলেও মানুষের একটা ধারণা আছে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বা বাংলা অঞ্চলের সংস্কৃতির ধারক-বাহক মানুষকে সাধারণভাবে মানুষ বাঙালি হিসেবে চেনে। কিন্তু 'প্রকৃত বাঙালি' কী জিনিস, এটা খুব অস্পষ্ট। এটা যে যার মতো করে ভেবে নিতে পারে। যার যা পছন্দ না, সেটাকে সে 'প্রকৃত বাঙালি'র বৈশিষ্ট্যের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে।

এটার উদাহরণ রাজনীতিতেও হরহামেশা দেখা যায়।

উদাহরণ ৪.১৯: রাজনীতিবিদকে বলা হলো, 'আপনার দলের একজন আজকে সন্ত্রাসী কাণ্ড করেছে।' সে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, 'সে আসলে আমার দলের না।' আমার দলের কেউ এমন কাজ করতে পারে না। খোঁজ নিলেই দেখবে, সে আসলে বিপক্ষ দলের সঙ্গে ছিল।'

এখানেও No True Scotmans ফ্যালাসি। আরও একটা উদাহরণ ভাবি।



উদাহরণ ৪.২০: একটা অফিসে সৃষ্টিশীল কাজকর্ম হয়। সেখানকার নিয়োগ কর্মকর্তা কখনো প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়োগ দিতে চান না। তিনি বলেন, 'প্রতিবন্ধীরা কখনো সৃষ্টিশীল হতে পারে না।' তাকে বলা হলো, 'কিন্তু হেলেন কেলার তো প্রতিবন্ধী হয়েও কী দারুণকাজ করেছেন। এমন আরও অনেকেই আছেন।' তিনি বললেন, হেলেন কেলার আসলে মনের দিক থেকে প্রতিবন্ধী ছিলেন না।

এখানেও দেখো, তিনি বক্তব্যকে একটু পাল্টে নিলেন যেন নিজের কথাটা ঠিক থাকে। বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তাতেও এমন ফ্যালাসির প্রয়োগ দেখা যায়।

উদাহরণ ৪.২১: আসল পুরুষ কখনো কিছুতে ভয় পায় না। তুই রাতে জঙ্গল দিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছিস। তুই আসলে পুরুষই না।

হাসিবের এই উদাহরণে হাসে সবাই। ভুলটা এখন চোখে ধরা পড়ে। পুরুষ ব্যাপারটা সবাই বুঝলেও আসল পুরুষ ব্যাপারটা কী, এটা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যে যার মতো করে ব্যাপারটাকে ব্যবহার করতে পারে।

এই উদাহরণটা দিয়ে হাসিব থামল। ক্লাস শেষের সময় হয়ে এসেছে। হাসিব বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমি যুক্তির কথা বলতে গিয়ে অঙ্ক থেকেই দূরে সরে যাচ্ছি।

যারা আরও জানতে আগ্রহী তাদের অবশ্য আলাদা করে বোঝাতে পারি।

আগ্রহী ছেলেমেয়েরা

সেদিন স্কুলের পরে হাসিব যখন বের হচ্ছে, সে সময় তিনজন ছেলেমেয়ে ওকে ডাক দেয়, 'স্যার, আপনার কি একটু সময় হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো কিছু দরকার?'

মেয়েটা বলল, 'স্যার, আমার নাম রিতা। আর ওরা হচ্ছে হাফিজ আর এনাম। আমরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'অবশ্যই' হাসিব ওদেরকে নিয়ে একটা খোলা ক্লাসরুমে গিয়ে বসে।

'স্যার, আমাদের স্কুলে কেউ কখনো বিতর্ক প্রতিযোগিতা করেনি', রিতা বলে, 'কিন্তু আপনার যুক্তির ক্লাসগুলো শুনে মনে হচ্ছে বিতর্ক খুব মজার একটা ব্যাপার হবে।'

হাসিব হাসে, 'শুধু যুক্তির দুটো ক্লাস করেই বিতর্ককে মজার বলাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। Hasty Generalization ফ্যালাসির ভেতরে পড়ে যেতে পারে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব দারুণ। বিতর্ক করতে আমি নিজে খুব ভালোবাসতাম।'

'স্যার, এখানে প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ হয়, সেখানে নানা প্রতিযোগিতা হয়। তার ভেতরে একক বিতর্কও থাকে। আমরা প্রথমে সেটাতে অংশ নিতে চাই, তারপর দল করে দলগতভাবেও অংশ নিতে চাই।'

ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে খুশি হয় হাসিব। বলে ঠিক আছে, এখন থেকে প্রতি শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় আমরা যুক্তি নিয়ে কথা বলব। তোমাদের ক্লাসে আমি যে ফ্যালাসিগুলো

নিয়ে বলছিলাম, তেমন ফ্যালাসি আরও অনেক আছে। আমি দেখেছি আমি নিজে যখন শিখি তখন সবচেয়ে ভালো শিখি যখন ভুল থেকে শিখি। তোমাদের ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োগ করে দেখতে পারি।

'স্যার, কোথায় আসব আমরা?'

হাসিব একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় ওর নিজের ঘরটার কথা ভেবে। বই আর জামাকাপড়ে যে অগোছালো অবস্থা হয়েছে, সেটা ঠিক করা বেশ কষ্টের কাজ হবে এখন। নাহ, বাসায় আসতে বলা যাবে না। তার চেয়ে বাইরে কোথাও কথা বলাই ভালো।

'তোমরা এক কাজ করো, স্কুলের গেটের বাইরে রাস্তার ওপারে হালিম ভাইয়ের চায়ের দোকানটা আছে না, ওখানেই আসতে পারো!'

'আচ্ছা!'

হুট করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কি

হালিম ভাইয়ের চা-দোকানে

ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় হালিম ভাইয়ের চায়ের দোকানের বাইরে এসে হাজির হলো তিন বন্ধু—এনাম, হাফিজ, আর রিতা। হাসিব এল তার দশ মিনিট পরে। ঢুকেই বেশ বিনীত মুখে ছাত্রছাত্রীদের বলল, দুঃখিত, দেরির জন্য। শিক্ষকের বিনয় দেখে ছাত্রছাত্রীদের খুব একটা অভ্যেস নেই, ওরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হাসিব বুঝল ব্যাপারটা। আর কথা না বাড়িয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে গেল ওদের নিয়ে।

ভেতরে একটা টেবিলে পাঁচটা চেয়ার লাগিয়ে দিলেন দোকানের মালিক হালিম ভাই। ছোট্ট দোকানটা একাই চালান তিনি। মাঝে মাঝে স্কুলের পর হালিম ভাইয়ের দশ বছর বয়সী ছেলেটাও এসে যোগ দেয়। আজ অবশ্য ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে না। 'হালিম ভাই, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক কাপ চা আর একটা করে শিঙাড়া দিয়েন', হাসিব অর্ডার দিল। জানিয়ে দিল নাশতার খরচ সে-ই দেবে। ছেলেমেয়েরা বেশ খুশি হলো তাতে। হাসিব বুঝল জরুরি কথা বলার এখন সময়।

সেদিন তোমাদের বলেছিলাম, আমি যুক্তির ব্যাপারটা তোমাদের শেখাব ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে। এখন থেকে প্রতিদিন একটা-দুটো করে ভুল তোমাদের শেখাব। আজ প্রথম যে ভ্রান্তি বা

Fallacy-টা তোমাদের শেখাব, তার নাম 'Post hoc ergo propter hoc'। সোজা বাংলায় বললে, 'পরে ঘটেছে তাই কারণে ঘটেছে'। হাফিজ জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার কেমন কথা?' 'চলো বোঝাই!'

ভ্রান্তির নাম POST HOC ERGO PROPTER HOC– পরে ঘটেছে মানেই আগেরটার কারণে ঘটেছে

'Post hoc ergo propter hoc' এটার মানে হচ্ছে যে একটা ঘটনার পরে অন্য একটা ঘটনা ঘটেছে– এটা দেখেই তুমি বুঝে নিলে প্রথমটার কারণেই দ্বিতীয়টা ঘটেছে। একটা ঘটনা ভাবা যাক।

উদাহরণ ৫.১: মনে করো সকালবেলা আমি পানি খেলাম, পানি খাওয়ার পরে দুপুরবেলা থেকে আমার পেট খারাপ। এ থেকে আমি ধরে নিলাম, পানি খেয়েই আমার পেট খারাপ। যেমন এ ক্ষেত্রে ঘটনাটাকে আমরা এমন করে সাজিয়ে বলতে পারি,

সকালে পানি খেয়েছি [আশ্রয় বাক্য]

এরপর থেকে পেট খারাপ [আশ্রয় বাক্য]

পানির কারণেই আমার পেট খারাপ [সিদ্ধান্ত]

সমস্যা হলো, এই যুক্তিটা ঠিক যুক্তি নয়। হাফিজ একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল, 'স্যার, এখানে ভুলটা কই? আমার তো ঠিকই লাগছে! পানি খাওয়ার পরে পেট খারাপ হয়েছে, তাহলে তো পানিরই দোষ!'

হাসিব হাসল, আমি জানি অনেকেই এভাবে ভাবে। কিন্তু যুক্তির ভুলটা কোথায় জানো, শুধু এটুকু তথ্য থেকে পানিকে দোষ দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, এমন আশঙ্কা আছে যে পানির কারণে এটা হয়েছে। কিন্তু আরও তো ঘটনা থাকতে পারে। পানি খাওয়ার আগে-পরে আরও অন্য কিছুও তুমি খেয়ে থাকতে পারো। সকালে যে নাশতাটা তুমি করেছ, সেখানে যদি কিছু থাকে?

তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে মাঝে অন্য কোনো ঘটনা আছে কি না। আরও অন্যান্য কারণ আছে কি না, সেটা বিবেচনা না করেই ঠাস করেই একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসের সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার বলি, এই ভ্রান্তি থেকে অনেক কুসংস্কারও জন্ম নেয়।



উদাহরণ ৫.২: ২০২০-এ পৃথিবীটা থমকে গেল কোভিড-১৯-এর আক্রমণে। এ সময় চারদিকে নানা তথ্য ঘুরে বেড়িয়েছে। মনে করো, কেউ একজন বলল যে আমি দূর্বাঘাস খেয়েছিলাম, এরপর আমার করোনা সেরে গেছে। আমি কিন্তু স্রেফ উদাহরণের জন্য বলছি। আবার তোমরা যেন মনে কোরো না আমি সত্যি সত্যি দূর্বাঘাস খেতে বলছি।

যাহোক ধরো, কেউ দূর্বাঘাস খেল, খাওয়ার কয়েক দিন পরে সে ভালো হয়ে গেল। সে সবাইকে বলে বেড়াল যে এই দূর্বাঘাস খাওয়ার কারণে আমার করোনাভাইরাস সেরে গেছে। এটা কিন্তু সেই 'Post hoc' ফ্যালাসি। এমন দাবি কেউ করলে আগে

প্রশ্ন করবে, আপনি কী করে নিশ্চিত হচ্ছেন যে দূর্বাঘাসের কারণেই সেরেছে?

আমরা এখন জানি যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি ৫ জনের ৪ জনই সুস্থ হয়ে যায় কোনো ওষুধ ছাড়াই। তারা দূর্বাঘাস না খেয়েই সুস্থ হয়। তাহলে দূর্বাঘাস না খেয়ে তারা সবাই যদি সুস্থ হয়, তাহলে আপনি কী করে নিশ্চিত থাকছেন যে আপনার ক্ষেত্রে ওই দূর্বাঘাসটাই কাজ করেছে।

বহু মানুষ ওই দূর্বাঘাসওয়ালা মানুষকে হয়তো বিশ্বাস করে বসবে। কিন্তু যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে তোমরা অত সহজে এটাকে মেনে নেবে না।

হাফিজ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু স্যার, দূর্বাঘাস থেকে উপকার হয়েছে– এমন সম্ভাবনা তো থাকতেই পারে।'

'হ্যাঁ, ফ্যালাসি বা ভ্রান্তিগুলোতে আমরা যুক্তির দুর্বলতাগুলো নিয়ে ভাবি। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় আন্দাজে দাগিয়ে কারও উত্তর ঠিক হতেই পারে। তাই বলে তাকে কি ভালো ছাত্র বলা যাবে? হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা আর সিদ্ধান্ত আলাদা বিষয়!'

যাহোক, Post hoc নামের এই উল্টোপাল্টা যুক্তির আরও কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

উদাহরণ ৫.৩: আমি বসে বসে একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিলাম। কিছুতেই বিপক্ষ দলের উইকেট পড়ছিল না।

> আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম [আশ্রয় বাক্য]
>
> তখনই একটা উইকেট পড়ল [আশ্রয় বাক্য]
>
> আমার উঠে দাঁড়ানোর কারণেই উইকেট পড়েছে [সিদ্ধান্ত]

উদাহরণ ৫.৪: টিভিতে সুগন্ধির বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য এমন–

একটা ছেলে গায়ে 'ABCD' নামক সুগন্ধি স্প্রে করল [আশ্রয় বাক্য]

এরপর নারীরা তার চারপাশে এসে ভিড় করল [আশ্রয় বাক্য]

ছেলেরা 'ABCD' সুগন্ধি মাখলে মেয়েরা তার চারপাশে ঘুরঘুর করে [সিদ্ধান্ত]

যুক্তিগুলো যে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, এটা সহজেই বুঝতে পারল সবাই। উদাহরণগুলো খুব চেনা হওয়ায় হেসে ফেলে সবাই। হাসিবও হাসিমুখ নিয়েই বলল, 'বিজ্ঞাপনগুলোতে এমন কুযুক্তি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। ধীরে ধীরে আরও কয়েকটা তোমাদের বলব।'

সবার আলতো হাসির মাঝে জোরে হেসে ওঠে এনাম। ও দেখায় চা-দোকানের দেয়ালে একটা ছবি উল্টো করে রাখা। সেটা দেখে হাসিব ডাক দেয় হালিম ভাইকে, 'ভাই, এটা ওল্টানো কেন?'

উদাহরণ ৫.৫: হালিম ভাই ছুটে আসেন। কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন এমন একটা খুশি-ভাব চোখে নিয়ে জানান, 'ভাই, এটার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। প্রথম ছয় মাস দোকানে কেনাবেচা ভালো ছিল না। এই ছবিটা উল্টা করে দেওয়ার পর থেকে কেনাবেচা ভালো। ছবিটা তাই উল্টা করেই রাখছি।' 'ও, খুবই রহস্যময় ব্যাপার!' হাসিব মুখ টিপে হেসে সবার দিকে তাকায়। তার তাকানোর অর্থ বুঝতে পারে সবাই।

সতর্কতা

হালিম ভাই চলে যান। হাসিব এবার সবাইকে বলে, 'একটা ব্যাপার মাথায় রেখো। ফ্যালাসিগুলোতে একটা সতর্কতার ব্যাপার আছে। তা না হলে যেটা হয়, সেটাকে বলে Fallacy Fallacy বা ভ্রান্তির ভ্রান্তি।

'সেটা আবার কী রকম?', এনাম খুবই কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়।

'মনে করো, কেউ একটা যুক্তি দিল। সেই যুক্তিতে একটা ভুল আছে। এটা দেখে তুমি বললে, যেহেতু যুক্তিতে ভুল আছে, তাই এর সিদ্ধান্তটা ভুল। এই কাজ করাটাও কিন্তু ঠিক না। যেমন ধরো কেউ বলল,

২ আর ৫-এ হয় ৭ [আশ্রয় বাক্য]

৫ আর ৬-এ হয় ১১। [আশ্রয় বাক্য]

এ থেকে বলা যায় ৩ আর ৭-এ হবে ১০ [সিদ্ধান্ত]

যুক্তি নিঃসন্দেহে ভুল, কারণ প্রথম দুই লাইন থেকে তিন নম্বর লাইন বলা যায় না। কিন্তু দেখো ফলাফল এখানে ঠিক। এখন যদি কেউ বলে যেহেতু যুক্তিটা ভুল, সুতরাং সিদ্ধান্তটা ভুল হবেই, সেটাও একটা ফ্যালাসি। যুক্তির ভুল নিশ্চিত করে না যে সিদ্ধান্ত ভুল হবেই।

'কিন্তু স্যার, সেটা এই post hoc fallacy-র কথা বলতে গিয়ে কেন বললেন?'

এটা বললাম তোমাদের সতর্ক করে দিতে। তোমরা এখন নানা রকমের ফ্যালাসি যখন দেখবে, তখন অনেক কিছুকে সরাসরি ভুল মনে হতে পারে। যেমন দেখো,

করিমের গায়ে ব্যথা, সে প্যারাসিটামল খেল [আশ্রয় বাক্য]

তার ব্যথা কমে গেল [আশ্রয় বাক্য]

প্যারাসিটামল খেলে ব্যথা কমে যায় [সিদ্ধান্ত]

সত্যি কথা হলো, যুক্তির বিবেচনায় এখানে একটা ফ্যালাসি আছে। শুধু এটুকু যুক্তি থেকে, নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে আসলে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না যে প্যারাসিটামল খেলে ব্যথা কমে যায়। কিন্তু দেখো, এই সিদ্ধান্তটা আসলে ভুল নয়। সমস্যা হলো প্রমাণে, যুক্তির পথে। তুমি যদি যুক্তির পথটা ভুল দেখে ঘোষণা দাও যে এখানে Post Hoc ফ্যালাসি আছে, সুতরাং সিদ্ধান্ত ভুল, সেটাও কিন্তু আরেকটা ফ্যালাসি হবে।

'স্যার, তাহলে একটা ওষুধ যে কাজ করে, সেটা বোঝার উপায় কী?'

একটা ওষুধ যে কাজ করে, সেটা প্রমাণের জন্য ওষুধ তৈরিকারকদের খুবই কঠিন ট্রায়াল বা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে অনুমোদন পাওয়া মুশকিল। বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব বা একটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় যুক্তি-তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি ব্যাপার।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ যখন এলই, একটা ব্যাপার বলি। বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের একটা বড় ভূমিকা আছে– এটা হয়তো জানো এবং পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রায়ই খেয়াল করা হয়, সেটা হলো দুটো ডেটাসেটের ভেতরে কোনো মিল আছে কি না। একটা বাড়লে কি অন্যটা কমে বা বাড়ে? এমন মিলকে বলে Correlation।

তখন আরেকটা ফ্যালাসির সম্ভাবনা থাকে, যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একটা উক্তি দিয়ে।

Correlation does not imply causation, অর্থাৎ দুটোর মধ্যে মিল থাকলেই নিশ্চিত করা যায় না যে একটার কারণে আরেকটা ঘটছে।

চলো, সেটা এবার ব্যাখ্যা করা যাক।

ভ্রান্তির নাম CORRELATION IS CAUSATION– মিল আছে মানেই একটার কারণে আরেকটা ঘটেছে

হাসিব বলে, Correlation আর Causation-এর ফ্যালাসিটা অনেকটা Post hoc fallcy-র মতোই। Post hoc-এ আমরা দেখেছিলাম একটার পরে আরেকটা ঘটছে। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হলো, একটার সঙ্গে আরেকটা ঘটছে। একটা যখন বাড়ছে, আরেকটাও তখন বাড়ছে। একটা যখন কমছে, আরেকটাও তখন কমছে। অথবা হয়তো একটা উল্টো সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। একটা বাড়লে, আরেকটা কমছে আর একটা কমলে আরেকটা বাড়ছে। এটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে এদের কমা-বাড়ার ভেতরে একটা মিল আছে।

এই মিল দেখেই কেউ যদি বলে ফেলে যে একটার 'কারণে'ই আরেকটা ঘটছে, তখন এই Causation, correlation-এর ফ্যালাসিটা হয়।

উদাহরণ ৫.৬: এটার একটা প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে এ রকম। ধরো, নিউইয়র্ক শহরে একবার দেখা গেল যে মানুষ যখন আইসক্রিম বেশি খায় তখন খুন বেশি হয়। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। এ থেকে কেউ ধরো একটা তত্ত্ব দিয়ে দিল,

> আইসক্রিম যখন বেশি খাওয়া হয়, তখন খুন বেশি হয় [আশ্রয় বাক্য]
>
> আইসক্রিম মানুষকে খুন করতে উৎসাহ দেয় [সিদ্ধান্ত]

ঘটনাটা কেমন দাঁড়াল? আমি কি আইসক্রিমকে দোষ দেব যে আইসক্রিম খায় বলেই খুন হয়? পরে জিনিসটা দেখা গেল খুব সহজ।

ঘটনা হলো এমন, নিউইয়র্ক একটা ঠান্ডা এলাকা। বছরের অধিকাংশ সময় এটা ঠান্ডাই থাকে। যে সময়টায় মানুষ ঘুরতে-ফিরতে বেশি বের হয়, সেটা হলো গ্রীষ্মের সময়।

এখন গ্রীষ্মের সময় মানুষজন আইসক্রিম বেশি খায়। আবার গ্রীষ্মের সময় ওখানকার সব মানুষই বাইরে বেশি বের হয়। সন্ত্রাসী দলগুলোও এ সময়ে বেশি বের হয়। এ সময়ে খুনখারাবি বেশি হয়।

আইসক্রিমের কেনাকাটা বেশি হওয়া আর খুন বেশি হওয়ার মূল যেই সূত্র, সেটা হলো গ্রীষ্মকাল। সেই সংযোগ ঘটেছে তাপমাত্রা দিয়ে। তাপমাত্রা বেশি বলে মানুষজন আইসক্রিম বেশি খাচ্ছে, তাপমাত্রা বেশি বলে খুনখারাবি বেশি হচ্ছে। তার মানে এখানে আইসক্রিমের জন্য খুনখারাবি হচ্ছে না। এখানে দুটোই একটি কমন উৎসের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তার মানে এই না যে একটার কারণে আরেকটা হচ্ছে।

আসলে দুই ঘটনার ভেতরে যখন Correlation থাকে, তখন চার রকমের ঘটনা ঘটতে পারে–

১. প্রথমটার কারণে দ্বিতীয়টা ঘটছে

২. দ্বিতীয়টার কারণে প্রথমটা ঘটছে

৩. দুটো ঘটনাই তৃতীয় কোনো কারণে ঘটছে

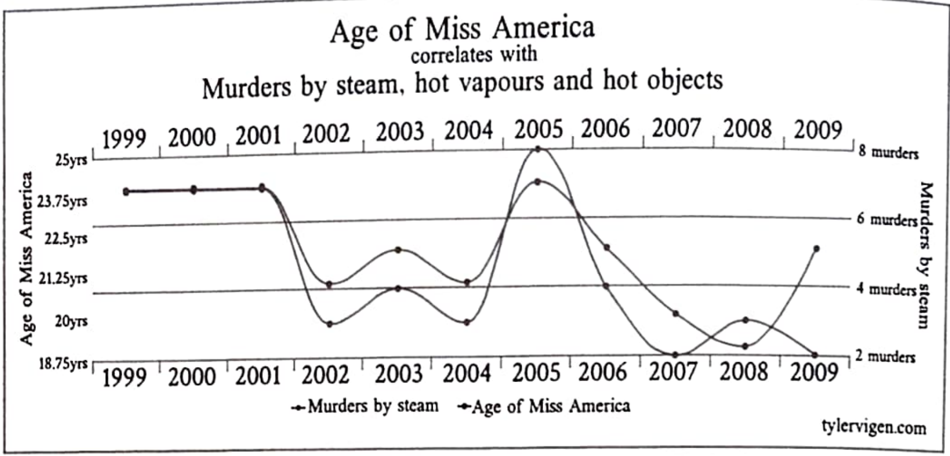
৪. দুটোর মিল পুরোপুরি কাকতালীয়

যেমন ওপরের উদাহরণে আমরা দেখেছি তৃতীয় একটা কারণ 'গ্রীষ্মকাল'-এর কারণে ওই দুটো ঘটনা ঘটেছে। অনেক সময় মিল পুরোপুরি কাকতালীয় হতে পারে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমে মিলে গেছে, এদের ভেতরে আসলে কোনোই সম্পর্ক নেই।

তোমাদের একটা ওয়েবসাইটের কথা বলতে পারি, যেখানে এই জাতীয় অদ্ভুত মিলগুলোর একটা তালিকা আছে।

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

সেখানে খুব সুন্দর করে দেখায়, কত অদ্ভুত রকমের মিল হতে পারে। মনে করো, আমেরিকার সুন্দরীদের বয়স আর প্রতিবছর কত মানুষ গরম পানি বা বাষ্পে মারা যায়, এই দুটো তথ্যের মধ্যে দারুণ মিল আছে। তাহলে কী...?



ওরা সবাই হেসে ফেলে।

হাসিব বলে, 'না, উত্তর হচ্ছে এই মিল থেকে কিচ্ছু বলা যায় না।'

গাণিতিকভাবে বা numerically দুটো সংখ্যা যদি ঠিক একইভাবে বাড়ে, তখন আমরা বলি দুটোর মধ্যে একটা correlation আছে। কিন্তু দুটো একই হারে বাড়া মানে এই না যে দুটোর মধ্যে 'cause and effect' বা কারণ-ফলাফলের কোনো সম্পর্ক আছে।

উদাহরণ ৫.৭: একটা ঘটনার কথা বলি। নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ যখন সারা পৃথিবীতে মহামারি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, বিজ্ঞানীরা প্রতিকারের নানা উপায় খুঁজতে লাগলেন। নানা গবেষণা হলো এবং সেগুলোর ফলাফলের ওপর বিজ্ঞানীরা গবেষণাপত্র লিখলেন।

একদল গবেষক একটা কৌতূহলোদ্দীপক পর্যবেক্ষণ দেখলেন। তারা দেখলেন যেসব এলাকায় যক্ষ্মার টিকা (বিসিজি) দেওয়া হয় সেসব এলাকাতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কম হয়। এমন একটা গবেষণাপত্র আসলেই প্রকাশিত হলো।

এটা দেখেই পত্রিকাওয়ালারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল বিসিজির টিকা দিলে করোনা হয় না। খেয়াল করো, গবেষকেরা কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেননি। তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারপর যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে বিসিজির টিকা নিলে শ্বাসতন্ত্রের অন্য কিছু রোগও কমে যাওয়ার নজির আছে। তাই আমাদের মনে হয়, এটা নিয়ে আরও গবেষণা করা হোক।

অর্থাৎ, তারা এতসব পর্যবেক্ষণ, যুক্তি দিয়েছেন যেন আরও গবেষণা করা হয়, সেইটুকু বলতে।

অর্থাৎ Correlation দেখলে উড়িয়েও দেওয়ার দরকার নেই, আবার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলার কিছু নেই। আরও যুক্তি-তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখতে হবে এদের ভেতরে Causation-এর সম্পর্ক আছে কি না।

যে রকম আরেকটা উদাহরণ আমরা বলতে পারি।

উদাহরণ ৫.৮: তোমরা হয়তো জানো, কোভিড-১৯ রোগ শুরু হয়েছিল চীনের উহান শহরে। সেখানকার একটা গবেষণায় দেখা গেল, উহানে যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের ভেতরে যারা বয়স্ক, যাদের বয়স ৬৫-এর ওপরে এ রকম মানুষজন জটিল অবস্থায় চলে যাচ্ছে। আরও দেখা গেল যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই আক্রান্তের হার বা রোগ জটিল আকার ধারণের ঘটনা কম।

এখন এই একটা গবেষণা যদি প্রকাশিত হয়, এখান থেকে আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব? উত্তর হচ্ছে, আমরা কোনো সিদ্ধান্তে যেতে পারি না। ওই এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন, জনসংখ্যার বিন্যাস কেমন—অনেক ব্যাপার এখানে আছে।

যদি আমরা দেখি যে আমরা যেই বিষয় নিয়ে ভাবছি, সেটুকুর বিচারে উহানের পরিস্থিতি সারা পৃথিবী থেকে খুব একটা আলাদা না। আমরা যদি এমন আরও যৌক্তিক কারণ দাঁড়া করাতে পারি, তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে একটা অনুমান (conjecture) মনে মনে ভাবতে পারি।

কিন্তু মনে রেখো, যেই তথ্য দিয়ে অনুমান বা তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়, সেই একই তথ্যকে তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে দেখানো যায় না।

মনে করো, তুমি উহানের তথ্য দিয়ে তত্ত্ব দাঁড় করালে যে বয়স্ক ব্যক্তিরা বেশি আক্রান্ত হয়। তারপর কেউ জিজ্ঞেস করল, তোমার প্রমাণ কই? তুমি উহানের তথ্যই দেখালে, সেটা ঠিক না। কারণ, ওটা দিয়েই তো তত্ত্ব বানিয়েছ, ওটা তো মিলবেই।

একটানা বলে যাচ্ছিল হাসিব। এবারে রিতা ভ্রু কুঁচকে বলল, 'স্যার, তাহলে কি বৃদ্ধরা আসলে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে না? আমরা তো দেখছি বৃদ্ধরাই বেশি জটিল রোগের শিকার হচ্ছে।'

হাসিব হাসে, 'তুমি আবার ফ্যালাসি-ফ্যালাসিতে পড়ে গেলে। একটা উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া এই প্রক্রিয়াটা ভুল। তার মানে এই নয় যে সিদ্ধান্ত ভুল হবেই। যুক্তির পথ ভুল হলেও সিদ্ধান্ত ঠিক হতে পারে।

'আর হ্যাঁ, আমরা এখন নিশ্চিত করে জানি যে কোভিড-১৯-এ যারা বেশি জটিল অবস্থায় পড়েন, বয়স্ক রোগীরা তাদের অন্যতম।'

তোমাদের একটা ব্যাপার বলি। আমাদের উপমহাদেশে টিকা ব্যাপারটা নিয়ে মানুষের ভেতরে তেমন নেতিবাচক কোনো ধারণা নেই। টিকা নিলে জটিল সব রোগ থেকে বাঁচা যায়, এমনটাই জনমানুষের ভাবনা। এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য যা আছে তার ভিত্তিতে এই ভাবনা পুরোপুরি ঠিক আছে।

উদাহরণ ৫.৯: কিন্তু আমেরিকার মতো উন্নত দেশে সাধারণ মানুষের ভেতরে টিকা নিয়ে কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে একদল মানুষ দেখাতে শুরু করল, যেই বয়সে বাচ্চারা টিকা নেওয়া শুরু করে, সেই বয়স আর যেই বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা যায়, সেই বয়সগুলো কাছাকাছি। খেয়াল করো, বয়স দিয়ে দুটোর ভেতরে একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল। ব্যস, আর যায় কোথায়! লোকে বলতে শুরু করল, টিকার সঙ্গে অটিজমের একটা যোগসূত্র আছে। টিকার কারণে অটিজমে আক্রান্ত হয়। কী ভয়ংকর কথা!

তখন বিজ্ঞানীরা কী করল বলো তো। তারা অনেকগুলো গবেষণা করলেন এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন, এই দুইয়ের ভেতরে আদতে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'যাক বাবা, শান্তি পেলাম, আমি তো ভয়ই পেয়ে যাচ্ছিলাম', রিতা বলল। এনাম বলে, 'স্যার, আমার মনে হয়, ভ্যাকসিন না নেওয়ার

সঙ্গে গাধামির একটা সম্পর্ক আছে। ভ্যাকসিন যারা নেয় না, সব কয়টা গাধা।'

হাসিব হাসে। বলে, 'এনাম, আমি এর পরে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তোমার এই শেষ বক্তব্যটা আমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। না, এভাবে ঢালাও বক্তব্য দেওয়াটাও আসলে যৌক্তিক না।'

'খুব অল্প তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা যখন একটা ঢালাও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, সেটাও একটা ফ্যালাসি তৈরি করে। সেটাকে বলে Hasty Generalization।'

ভ্রান্তির নাম HASTY GENERALIZATION– তাড়াহুড়ো করে ঢালাও সিদ্ধান্তে আসা

তোমাদের সম্ভবত ক্লাসে একদিন বলেছিলাম, আবারও বলি। একটা ঘটনা ভাবো।

উদাহরণ ৫.১০: তুমি একদিন কোনো একটা কাজে মদনপুর গ্রামে গেছ। সেখানে রমিজ মাস্টারের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু তুমি তার বাসাটা চেনো না। একজন লোক রাস্তায় হাঁটছিল। তাকে ডেকে বললে, ভাই, রমিজ মাস্টারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

সে বলল, 'ধুত্তুরি, ওইসব আমি জানি না, আপনি নিজে খুঁজে নেন।' বলে সে চলে গেল।

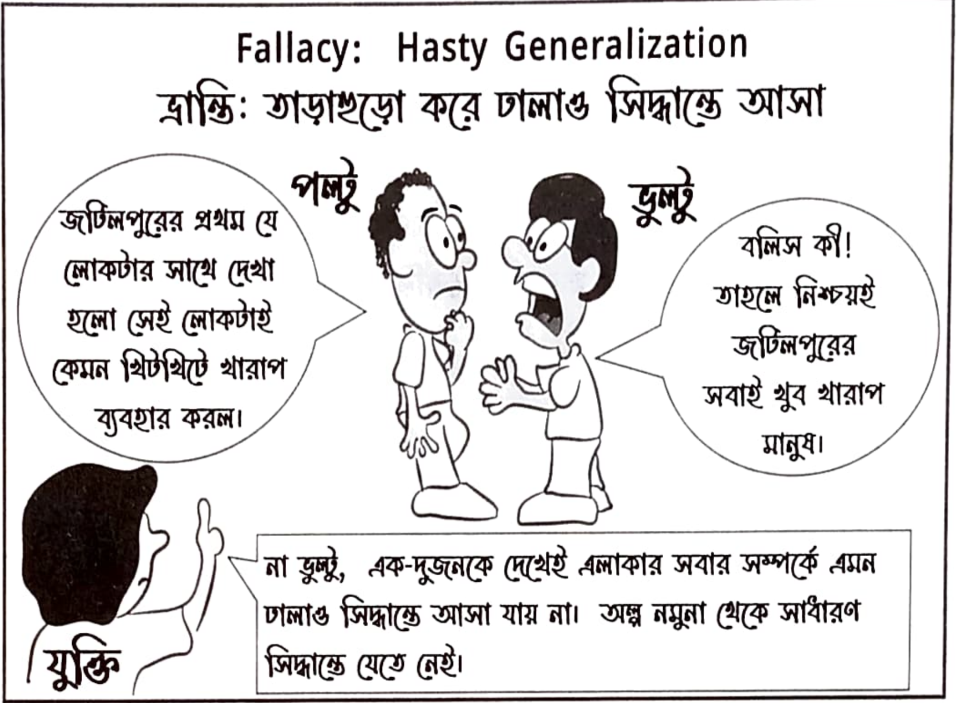
এবার তুমি মনে মনে ভাবছ,

> মদনপুর গ্রামের প্রথম যার সঙ্গে দেখা হলো, সেই লোকটাই খারাপ [আশ্রয় বাক্য]
>
> অতএব এই গ্রামের বেশির ভাগ লোকই খারাপ [সিদ্ধান্ত]

এই যে একজনকে দেখেই তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাড়াহুড়ো করে ঢালাও সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না।

শুধু একজন কেন, দশজনকে দেখেও তুমি এই সিদ্ধান্তে যেতে পারো না।

এনাম বলল, 'তাহলে সিদ্ধান্তটা নেব কীভাবে? সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো আর দেখে আসতে পারি না কে ভালো, কে মন্দ।'



'খুব সুন্দর প্রশ্ন,' হাসিব বলে, 'এ রকম ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হয় ছোট স্যাম্পল নিয়ে। অর্থাৎ সবগুলো না নিয়ে কয়েকটা নিয়ে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এই যে ছোট্ট একটা স্যাম্পল তুমি নিচ্ছ, সেটা কেন সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করে, সবার প্রতিনিধিত্ব করে, সেটার পেছনে যুক্তি থাকতে হবে।'

যেমন একটু আগে বললাম, একজন মানুষকে দেখে গোটা গ্রামের মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু এর একটা উল্টো উদাহরণ আছে। ভাত রান্নার সময় একটা বা কয়েকটা ভাত টিপে সব ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না, বলে দেওয়া যায়।

কেমন উল্টো হলো না ব্যাপারটা?

নাহ, এটা পুরোপুরি যৌক্তিক। কারণ, একটা পাত্রে ভাত সেদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব উপাদান দরকার হয়, সেগুলো হলো মূলত পানি, চাপ আর তাপমাত্রা। যখন ভাত রান্না করা হয়, তখন যদি সব চাল যথেষ্ট পানিতে ডোবানো থাকে, তখন সব চালের দানা প্রায় একই রকম পানি, চাপ, তাপমাত্রার পরিবেশে থাকে। ফলে কয়েকটা দানা সেদ্ধ

হলে ব্যবহারিক বিবেচনায় ধরে নেওয়া যায়, সব দানাই একই রকম পরিবেশ পেয়েছে। ফলে এই কয়েকটা দানা দেখেই সব সেদ্ধ হয়েছে কি না, ধারণা পাওয়া যায়।

এখানে খেয়াল করো, আমি শুধু এটুকু বলেই থামিনি যে 'কয়েকটা সেদ্ধ হয়েছে, তাই নিশ্চিত করছি যে সব সেদ্ধ হয়েছে।' এই কথার পাশাপাশি আমাকে যুক্তি দিতে হয়েছে, 'কেন' এই কয়েকটা দেখেই সবার কথা বোঝা যাবে।

এমন যুক্তি ওই গ্রামের ক্ষেত্রে খাটবে না। মানুষের ভালো-খারাপ হওয়া তার চারপাশের পরিবেশ, জিন এমন নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এক গ্রামের সবাই একই রকম পরিবেশ পেয়েছে, সবার জিন একই রকম– এসব কিছুই নিশ্চিত হওয়া যায় না। ফলে ভালো-খারাপের ঢালাও সিদ্ধান্ত দেওয়াটাও কোনোভাবে চলে না।

এই জায়গায় একটা কথা না বললেই না। এই যে কয়েকটা উদাহরণ দেখে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে যাওয়া, এটাকে বলে যুক্তির আরোহণ (Indcutive reasoning)। ওপরের উদাহরণটাকে এখানে এভাবে বলা যায়।

> কয়েকটা ভাত টিপে দেখলাম সেগুলো সেদ্ধ হয়েছে [আশ্রয় বাক্য]
>
> সেদ্ধ হওয়ার শর্ত বিবেচনায় ওই কয়েকটা ভাত পাত্রের সব ভাতের প্রতিনিধিত্ব করে [আশ্রয় বাক্য]
>
> অতএব এই পাত্রের সব ভাত সেদ্ধ হয়েছে [সিদ্ধান্ত]

তোমরা হয়তো গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির নাম শুনে থাকবে। সেটাও আরোহণ।

রিতা বলল, 'আরোহণ মানে তো ওঠা, তাই না?'

হাসিব বলল, 'ঠিক তাই। আরোহণ পদ্ধতিতে যদি সাধারণ সিদ্ধান্তে যেতে চাও, মাথায় রাখবে, ওপরে উঠতে হলে একটা ভিত্তি লাগে, সঙ্গে লাগে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি না থাকলে ওপরে ওঠা যায় না।'

যাহোক তাড়াহুড়ো ঢালাওকরণের আরেকটা উদাহরণ বলা যাক।

উদাহরণ ৫.১১: মনে করো, কেউ একজন এভাবে বলল—

আমার দাদা দিনে চার প্যাকেট করে সিগারেট খেত, তাও ১৪ বছর বয়স থেকে। সেই লোক কিন্তু ঠিকই ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছে। তাহলে সিগারেট খাওয়ায় আসলে সমস্যা নেই।

একজন মানুষের উদাহরণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেন, তার উদাহরণ সবার জন্য সত্য হবে তার কোনো যুক্তি আছে কি? কোনো গবেষণা আছে কি? না, বরং উল্টো গবেষণা বলছে, ধূমপান মানুষের আয়ু গড়ে ১০ বছর কমিয়ে দেয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তোমাদের বলি।

আমরা যখন পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলি, তখন স্যাম্পলটা কতখানি নির্ভরযোগ্য, সেটা খেয়াল রাখতে হয়। যেমন লুডুর ছক্কা যদি unbiased হয়, সেখানে কোনো কারচুপি না থাকে, তাহলে গড়ে প্রতি ছয়বারে একবার ছয় পড়বে। এখন ধরো একজন লুডু খেলতে খেলতে দেখল, ছয়বার চাললে তিন ছয় একটা ২ আর দুইবার ৪ পড়েছে। এমন কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়।

সে এবার বলল, তাহলে কোথায় গেল সব হিসাব। সম্ভাব্যতা বা পরিসংখ্যান কখনো নিশ্চিত করে বলে না যে প্রতি ছয়বারে ঠিক একবার ছক্কা পড়বে। এটা বলে যে নমুনা সংখ্যা যত বেশি হবে, তত সম্ভাব্যতা বেশি হতে থাকবে ১/৬-এর কাছে পৌঁছে যাবে। ৬ কোটিবার চাললে ছক্কার সংখ্যাটা ১ কোটির কাছেই থাকবে, এটা নিশ্চিত করা যায়।

অল্প নমুনা নিয়ে ভাবলে সেখানে বিচ্যুতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এর ওপরে নির্ভর করা যায় না।

উদাহরণ ৫.১২: একটা উদাহরণ চিন্তা করা যাক। মনে করো, টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে পাঁচজনের মধ্যে চারজন দাঁতের ডাক্তার ক-খ-গ-ঘ নামের টুথপেস্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তাহলে নিশ্চয়ই এই ক-খ-গ-ঘ নামের টুথপেস্ট খুবই ভালো একটা টুথপেস্ট।

এটা শুনলে তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো দারুণ একটা ব্যাপার, পাঁচজনের মধ্যে চারজনই এটাকে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তুমি হয়তো আর একটু খোঁজ নিলে। খোঁজ নিয়ে দেখলে যে শুধু ওই পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে টুথপেস্ট ভালো নাকি খারাপ।

এ রকম অবস্থায় যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে খুব অল্প নমুনা নিয়ে আমরা কাজ করেছি। অল্প নমুনা নিলে বিচ্যুতির সম্ভাবনাও বেশি থাকে। সেখান থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। এমন হতে পারে যে পাঁচজনের ভেতরে হয়তো চারজন বলেছে ঠিক আছে। কিন্তু যদি ১০০০ জনের ভেতরে নেওয়া হয় হয়তো দেখা যাবে সেখানে মাত্র ২০ জন ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ খুব অল্প মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উপাত্ত থেকে একটা সিদ্ধান্তে যাওয়াটা ঠিক না।

আশা করি, Hasty Generalization সম্পর্কে একটা ধারণা তোমরা পেয়েছ। একটা শেষ উদাহরণ দিয়ে এই ফ্যালাসি সম্পর্কে আলোচনার ইতি টানব।

উদাহরণ ৫.১৩: ধরো, আমি বললাম,

আমি বৃষ্টির দিনে একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছি [আশ্রয় বাক্য]

বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করা উচিত [সিদ্ধান্ত]

এখানে খেয়াল করো, আমার একটা অভিজ্ঞতার ওপরে ভিত্তি করে একটা ঢালাও সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলাম।

'কিন্তু, স্যার, এটা কি খারাপ পরামর্শ?' এনাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না, বৃষ্টির দিনে প্রয়োজন না হলে গাড়ি না চালানোর পরামর্শ খারাপ না। তাই বলে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করাটা একটু বেশি দূর হয়ে গেল। কিন্তু আমি দুর্ঘটনায় পড়েছি, তাই সবাই পড়বে, অতএব নিষিদ্ধ করো— এই যুক্তি গঠন বৈধ না। গাড়ি চালানো আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে, চালকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, রাস্তার পরিস্থিতির

ওপর নির্ভর করে– এমন অনেক ব্যাপার সেখানে আছে; যা আমার হয়েছে তা বাকিদেরও হবে, কী করে নিশ্চিত হই?'

রিতা বলল, 'স্যার, মনে করেন নিষিদ্ধ না বলে বললাম সাবধানে চালানো উচিত। তারপর আমি যুক্তি দিলাম এভাবে: মনে করুন বৃষ্টিতে কেউ গাড়ি চালাচ্ছে। বৃষ্টিতে রাস্তা ভিজে পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে, গাড়ির চাকা পিছলে যেতে পারে, চাকা পিছলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যেতে পারে। মানুষ মারা গেলে তার সন্তানেরা আর্থিকভাবে অসহায় হয়ে পড়বে, তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, একটা পরিবার হয়তো পথে বসে যাবে। তাই গাড়ি সাবধানে চালানো উচিত।'

হাসিব হেসে ওঠে, 'গাড়িতে সতর্কতা ভালো পরামর্শ। কিন্তু এই যে তুমি এক বৃষ্টি হওয়া থেকে শুরু করে একেবারে একটা পরিবারকে পথে বসিয়ে দিলে, সেটাও একটু বেশি হয়ে গেল। তুমি যেটা করলে তাকে বলে Slippery Slope'. তোমার ওই বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল পথের মতোই এটা যুক্তির পিচ্ছিল পথ।

ভ্রান্তির নাম SLIPPERY SLOPE– যুক্তির পিচ্ছিল ঢালে গড়িয়ে বহুদূর

Slippery Slope মানে হলো পিচ্ছিল ঢাল। স্কুলের খেলার মাঠে বা শিশুপার্কে তোমরা স্লিপার দেখেছ না, বাচ্চারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সাঁই করে নেমে আসে? ওটা একটা স্লিপারি স্লোপ।

যুক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের ভ্রান্তি ঘটে যখন আমরা বলি, একটা ঘটলে আরেকটা ঘটবে, আরেকটা ঘটলে আরেকটা, সেটা ঘটলে আরেকটা। এমন করে করে অনেক ঘটনা একটার পরে একটা বলে আমরা দেখাই যে কী মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। তাই আমাদের প্রথমটা করা উচিত না। কিন্তু হয়তো প্রথমটা ঘটলে শেষটা ঘটবেই এমন সম্ভাব্যতা খুব কম।



উদাহরণ ৫.১৪: ধরো, মা তার বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে কেন ঠিকমতো স্কুলের বই পড়া উচিত। সে বলল এভাবে,

যদি তুমি এখন বইটা না পড়ো, তাহলে তুমি ক্লাসে ফেল করবে [আশ্রয় বাক্য ১]

যদি তুমি এই ক্লাসে ফেল করো, তাহলে তুমি স্কুল থেকেই বের হতে পারবা না [আশ্রয় বাক্য ২]

যদি তুমি স্কুল থেকেই বের হতে না পারো, তাহলে তোমার কলেজে– বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না [আশ্রয় বাক্য ৩]

যদি তুমি ভালো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাও, তাহলে তুমি ভালো চাকরি পাবে না [আশ্রয় বাক্য ৪]

যদি তুমি ভালো চাকরি না পাও, তাহলে তুমি সারা জীবন গরিব থাকবে [আশ্রয় বাক্য ৫]

অতএব তুমি সারা জীবন যদি গরিব থাকতে না চাও তাহলে এখনই বইটা পড়ো [সিদ্ধান্ত]

খেয়াল করো, একটা আশ্রয় বাক্যের ভেতরে তাকালে মনে হয় এমন তো হতেই পারে। কিন্তু শুরু আর শেষটা দেখো, এখনই বইটা না পড়লে সারা জীবন গরিব থাকবে, এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না।

যারা সম্ভাব্যতার অঙ্ক জানো, তারা অঙ্ক দিয়ে একটু ভাবতে পারো। ধরো, প্রতিটা আশ্রয় বাক্যের ভেতরের ঘটনাটা ঘটার সম্ভাব্যতা ৮০ শতাংশ। মানে হলো, যদি তুমি এখন বইটা না পড়ো, তাহলে তুমি ক্লাসে ফেল করবে– ধরে নাও, এটা ঘটার সম্ভাব্যতা শতকরা ৮০ ভাগ। এটা অনেক। এভাবে বাকিগুলোর প্রতিটা ঘটার সম্ভাব্যতাও ৮০% বা ০.৮০। এখন সম্ভাব্যতার গুণের হিসাব বলে যে সবগুলো একসঙ্গে ঘটার সম্ভাব্যতা হবে ০.৮০×০.৮০×০.৮০×০.৮০×০.৮০= ০.৩৩ । অর্থাৎ মাত্র ৩৩ শতাংশ। আলাদা করে প্রতিটা ৮০ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও একসঙ্গে সব হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। প্রথমটা ঘটলে শেষটা ঘটবে, এটা না হওয়ার সম্ভাব্যতাই বেশি।

অনেক দূরে গিয়ে কী হতে পারে, সেটা বলে যুক্তি দেওয়াটা তাই এক রকমের কুযুক্তি।

আরও উদাহরণ দেখি চলো।

উদাহরণ ৫.১৫: আমেরিকার কথা ভাবা যাক। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। সেখানে বার্নি স্যান্ডার্স নামে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বললেন, 'আমেরিকায় স্বাস্থ্যসেবা ফ্রি করে দেওয়া হোক, যেন সবাই বিনা মূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে।' এবার কিছু মানুষ বক্তব্য দিল, 'হ্যাঁ, এখন বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার কথা বলছেন, তারপর কয়েক দিন পরে বলবেন আমাদের বিনা মূল্যে গাড়ি দেন, বিনা মূল্যে মোবাইল ফোন দেন, বিনা মূল্যে খাবার দেন, সবকিছুই বিনা মূল্যে দেবেন। যখন বেশি জিনিস বিনা মূল্যে দেওয়া হবে মানুষ তখন কোনো কাজ করতে চাইবে না। শেষ পর্যন্ত পুরো দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধসে পড়বে।'

এখানে খেয়াল করে দেখো, মূল প্রসঙ্গটা ছিল সহজে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া সম্ভব কি না। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে কিন্তু বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা আছে, এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও গণস্বাস্থ্য যেটা, সেটা অনেক কম খরচে পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন বিপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হলো, তখন শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি ধসে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা এগিয়ে তিনি সমাপ্তি টানলেন। এটা

Slippery Slope-এর একটা উদাহরণ। একটা বাস্তবধর্মী কোনো কিছু দিয়ে শুরু, তারপরে এটা করলে ওটা হতে পারে, ওটা করলে সেটা হতে পারে– এমন করতে করতে শেষ পর্যন্ত খুবই অদ্ভুত একটা উপসংহারে গিয়ে পৌঁছায় এবং যিনি যুক্তিটা দিচ্ছেন, তিনি এমন একটা উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, যেটা দেখলে মানুষ ভয় পেয়ে যায় বা অবাক হয়ে যায়।

সতর্কতা

বারবার একটা জিনিস আমি তোমাদের বলতে চাই। এই ফ্যালাসিগুলো যখন ব্যবহার করবে, তখন সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করবে। Slippery Slope-এর কিন্তু যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব। ধরো, কেউ একজন যুক্তি দিল যে সমুদ্রের মধ্যে আমরা যে বর্জ্য ফেলছি, তা জমতে জমতে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলো মাছেদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। খেয়াল করে দেখো, এটা যদিও অনেক দূরের কথা, একেবারে বলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সেই কথাটা অযৌক্তিক নয়। স্লিপারি স্লোপ এটা তখনই যৌক্তিক হবে যখন আমরা যে ভবিষ্যতের কথাটা বলছি, সেই কথাটা আসলেই খুব সম্ভাব্য একটা ঘটনা হয়। অর্থাৎ আমরা মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারি যে এভাবে চললে ওই জায়গায় গিয়েই পৌঁছাবে।

হাসিব টানা অনেকক্ষণ বলার পর সুজন বলল, 'স্যার, বুঝতে পেরেছি। যদি একটা থেকে আরেকটা হওয়ার সম্ভাব্যতা হয় অনেক বেশি, যেমন ধরেন ৯৯ শতাংশ। তখন পাঁচবার একটার পর আরেকটা গুণ করলেও একসঙ্গে ঘটার সম্ভাব্যতা অনেকই থেকে যায়। ০.৯৯×০.৯৯×০.৯৯×০.৯৯×০.৯৯= ০.৯৫, সম্ভাব্যতা তখন ৯৫ শতাংশ। তবে স্যার একটা কথা।'

কী? বলো।

'এখন বাসায় যেতে হবে। যদি বাসায় না যাই, আব্বা ভাববেন আমি খারাপ ছেলেপেলের সঙ্গে মিশছি। আর না হলে ভাববেন আমি হারিয়ে গেছি। তারপর বাসায় ফিরলে চরম ধোলাই দেবেন। এরপর

আমার দাদা আবার প্রেসারের রোগী। আব্বা আমাকে ওইভাবে মারছেন দেখলে তিনি হার্টফেল করে মরেও যেতে পারেন!'

কী অলক্ষুণে কথা! হাসিব হতভম্ব ভাব নিয়ে তাকায় সুজনের দিকে।

সুজন মুখ টিপে হেসে বলে, 'স্যরি স্যার, একটু স্লিপারি স্লোপ প্র্যাকটিস করলাম।'

সবাই হেসে উঠল। হাসিব বুঝতে পারে আসলেই বেশ দেরি হয়ে গেছে।

'আমি খেয়ালই করিনি কখন এত বেলা হয়ে গেছে। ঠিক আছে তাহলে! আবার পরের সপ্তাহে কথা হবে। এখানেই।

'আচ্ছা!' বলে সবাই বিদায় নিল ওই দিনের মতো।

উল্টোপাল্টা দোহাই দিলে চলবে

বিতর্ক রাস্তার ধারে

হালিম ভাইয়ের দোকান। একটা টেবিলের একপাশে বসে আছে হাসিব। অন্যপাশে এনাম, সুজন আর রিতা। হাসিবের কাছে ছোট ছোট কাগজের নোট দেখা যাচ্ছে।

রিতা বলে, 'স্যার, আপনি কি সব সময় এমন ছোট ছোট কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন?'

হাসিব জানায়, বিতর্ক করতে করতে এটা একরকমের অভ্যেস হয়ে গেছে তার।

এবার এনাম বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ তোলে। আর দুই সপ্তাহ পরে শিক্ষা সপ্তাহের একক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ওরা সবাই নাম দিতে চায়।

হাসিব বলে, 'এটা তো খুবই ভালো কথা!' দাঁড়াও আজকে একটা কাজ করি। একটা ছোটখাটো বিতর্ক আয়োজন করি। না, এখানে চায়ের দোকানে না। চলো, আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় বসি। এমন একটা ভালো জায়গা কোথায় হতে পারে? আমার থেকে তোমরা ভালো বলতে পারবে।'

সুজন বলল, 'স্যার, বিলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, ওখানে একটা নতুন ব্রিজ বানিয়েছে। তার পাশে বসা যায়।'

'চলো, তাহলে!'

একটা খোলা ভ্যান ডেকে ওরা চায়ের দোকান থেকে সুজন যেখানে বলেছে সেই ব্রিজের পাশে গিয়ে বসল। হাসিব বলল, 'কেউ কেউ এমনিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে। আবার কেউ কেউ একটু চর্চা করলেই দারুণ বক্তা হতে পারে। তোমরা যেহেতু আগে বিতর্ক করোনি, আমি আশা করছি না যে প্রথমবারেই সব ঠিকঠাক হবে। বলাটা স্বতঃস্ফূর্ত না হোক, আপাতত চেষ্টা করবে যুক্তিগুলো ঠিকঠাক দিতে।

তোমাদের একটা বিষয় বলে দেব আমি। তোমরা ৫ মিনিট করে সময় পাবে। আমি আমার ফোনে সময় দেখব। ৪ মিনিট পর আমি একটা ছোট্ট তালি দেব। ওটা একটা সতর্কবার্তা। আর যখন ৫ মিনিট হয়ে যাবে তখন দুইটা তালি। তখন যে বাক্যটা বলছিলে, ওটা সুন্দর করে শেষ করে থেমে যাবে। ঠিক আছে?

'জি স্যার।' সবাই মনে হলো একটা মজার খেলা খেলার জন্য প্রস্তুত।

'আচ্ছা, বিষয় কী হতে পারে?' হাসিব বলল, 'এই মুহূর্তে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো জলবায়ু পরিবর্তন।'

শুনে ওরা একটু থতমত খেয়ে যায়। স্যার, আমরা তো এগুলোর কিছুই জানি না।

হাসিব বলে, 'কোনো অসুবিধা নেই। কেউ তোমাদের এখন নম্বর দিচ্ছে না। আমি শুধু বুঝতে চাইছি তোমরা এই মুহূর্তে কে কোন জায়গায় আছ। যা খুশি বলতে পারো।'

'কিন্তু স্যার, আমরা এটার পক্ষে বলব নাকি বিপক্ষে?'

'এটাও তোমাদের ইচ্ছা। তোমাদের এখানে সহজ করে দিই, বিতর্কের মূল জায়গাটা হলো সবচেয়ে বড় বিপদ। জলবায়ু পরিবর্তন যে বিপদ ডেকে আনছে, এটা আমরা জানি। কিন্তু এটাই কি সবচেয়ে বড় বিপদ? সেটা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে।'

'এখন তোমরা ১০ মিনিট করে সময় পাবে ভাবার। তারপর এনাম আগে বলবে। ঠিক আছে?'

‘আচ্ছা স্যার।’

বিতর্ক শেষে

প্রায় আধা ঘণ্টা বিতর্ক চলে তিন বন্ধুর। যে যার মতো বলার চেষ্টা করে।

এনাম বলে বিষয়ের বিপক্ষে। ও যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে, জলবায়ু পরিবর্তন নয়; বরং বড় বিপদ হলো রাষ্ট্রগুলোর একতাবদ্ধ হয়ে কাজ না করাটা। সবাই একসঙ্গে হলে হয়তো সমস্যাগুলো সমাধান করা যেত।

সুজন বলে বিষয়ের পক্ষে। ও বলার চেষ্টা করে এই মুহূর্তে পৃথিবীর যত সমস্যা– জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া, সুপেয় পানি কমে যাওয়া, মহামারি হওয়া– এগুলোর পেছনে আছে জলবায়ু পরিবর্তন।

রিতা বলে বিষয়ের বিপক্ষে। ও একটা অন্য রকম অবস্থান নেয়। ও বেশ কয়েকটা বিপদ তুলে ধরে বলে সেগুলো প্রতিটাই এত বেশি বড় বিপদ যে আলাদা করে জলবায়ু পরিবর্তনকে সবচেয়ে বড় বিপদ বলা যায় না।

হাসিব ওদের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়।

‘বিশ্বাস করো, আমি ভাবতেই পারিনি তোমরা প্রথমবারেই এতটা ভালো বিতর্ক করবে। তোমাদের অবশ্যই বিতর্ক বিষয়টাকে গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত।’

এরপর হাসিব বলে, ‘তোমরা যখন বিতর্ক করছিলে আমি খেয়াল করছিলাম তোমরা কোনো ফ্যালাসির ভেতরে পড়ে যাচ্ছ কি না। বেশ কয়েকটা পেয়েও গেছি। চলো, সেগুলো এবার বোঝাই।

এনাম, ‘তুমি জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে উদাহরণ দিয়েছ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি বলেছেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন একটা গুজব।’

এনাম হাসে, 'স্যার, সত্যি কথা বলছি, আমি জানি এটা গুজব না কিন্তু আমার আর কারও কথা মনে পড়ছিল না। তাই বলে দিয়েছি আরকি! স্কুলে রচনা লেখার সময় আমরা প্রায়ই ওমুক-তমুকের বাণী লিখে দিই। তাই এখানেও একটা বাণী লাগিয়ে দিলাম আরকি।'

হাসিব হেসে বলে, 'বাণী দিতে পারো। এমন কারও বাণী হতে হবে, যিনি ওই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। তুমি এখানে যে ভুলটা করেছে সেটাকে বলে appeal to questionable authority।

ভ্রান্তির নাম APPEAL TO QUESTIONABLE AUTHORITY– বিখ্যাত লোকের দোহাই: ওমুকে বলেছে, অমুকে করেছে, তাই এটা ঠিক

কোনো একজন বিখ্যাত লোক কিংবা একটা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিছু বলে দিলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। সেই মানুষ বা প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক কি না, আসলেই নির্ভরযোগ্য কি না, সেটা বিবেচনা করতে হয়।

Fallacy: Appeal to Questionable Authority

ভ্রান্তি: এমন কারও দোহাই দেওয়া যার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে

উদাহরণ ৬.১: বিজ্ঞাপনগুলোর ভেতরে প্রায়ই এই ব্যাপারটা লুকিয়ে থাকে। মনে করো, অভিনেতা জাহিদ হাসান হারপিকের বিজ্ঞাপন করলেন। বললেন, আমি হারপিক ব্যবহার করি, আপনিও করুন।

এখানে অন্তর্নিহিত যুক্তিটা এমন:

> জাহিদ হাসান একজন বিখ্যাত মানুষ, যিনি হারপিক ব্যবহার করেন [আশ্রয় বাক্য]
>
> সুতরাং হারপিক ভালো দ্রব্য, আপনারাও ব্যবহার করুন [সিদ্ধান্ত]

আদতে এই যুক্তি ভ্রান্তিময়। জাহিদ হাসান ব্যবহার করেন, শুধু এইটুকু যুক্তি আসলে হারপিককে ভালো প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এনাম ভ্রু কুঁচকিয়ে বলে, 'কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলোতে তো এমন প্রায়ই দেখি আমরা। যদি সব ভুলই হবে, তাহলে কেন এত ব্যবহার হয়?'

'ভালো প্রশ্ন! আসলে মার্কেটিং বা বিপণন আলাদা জিনিস। সেখানে মানুষের মনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে হয়। যুক্তি বিচারে অযৌক্তিক হলেই যে সেটা সাধারণ মানুষের পছন্দ হবে না, এমন কিন্তু না।

Cognitive Bias বলে একটা ব্যাপার আছে। মানুষের মনের ভেতরে কিছু পক্ষপাতিত্ব থাকে। সেগুলোকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে, মানুষের ভেতরে আবেদন তৈরি করতে পারলে, সেটা ঠিক যুক্তি হোক আর ভুল, তা দিয়ে ভালো রকম মার্কেটিং করা যায়।

যাহোক, আমাদের আলোচনা অবশ্য সেখানে না। আমরা শুধু যুক্তি বিচার করব।

Appeal to Questionable Authority অনেকভাবে হতে পারে। এর আরেক রকম উদাহরণ হতে পারে এমন: ধরো, একটা মানুষ সত্যিই কোনো একটা কথা বলেছে কি না, তার ঠিক নেই। কিন্তু তাকে ব্যবহার করে একটা বাণী দেওয়া।

উদাহরণ ৬.২: একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এমন একটা কথা ছড়াল। সিএনএন বলেছে, চীনে যে করোনাভাইরাস ছড়াচ্ছে এই কথাটা প্রথম যে লোকটা বলেছিলেন, তিনি ছিলেন চীনের একজন চিকিৎসক, যে চিকিৎসক পরবর্তী সময়ে মারা যান। সেই মানুষটা নাকি সবাইকে চা খাওয়ার উপদেশ দিয়ে গেছেন। চা পান করলে নাকি করোনাভাইরাস হবে না।

দেখো, এখানে অনেক সত্য-মিথ্যা একসঙ্গে মিশিয়ে জিনিসটা বানানো। দুইবার বিখ্যাত লোক বা প্রতিষ্ঠানের দোহাই দেওয়া হয়েছে। একটা সিএনএন বলেছ। সিএনএন যেহেতু নামকরা প্রতিষ্ঠান, তাই তাদের খবর নিশ্চয়ই ঠিক, এমনটাই ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় হলো, চীনের প্রথম যে লোকটা এটা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি একটা কথা বলেছেন।

এই যুক্তি মানুষের ভেতরে আবেদন তৈরি করবে, কিন্তু দেখো আশ্রয় বাক্য আসলে মিথ্যা। তিনি চা খেতে বলেছেন এমন কোথাও নেই। প্রথম যিনি কোভিড ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা জানান, তিনি যে মারা যান, এটা সত্যি কথা। এটা আসলেই সিএনএন বলেছে।

কিন্তু তিনি যে চা খেতে বলেছেন, এটা তিনিও বলেননি, সিএনএনও বলেনি। কায়দা করে একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য মানুষকে যুক্তির আবরণে মুড়িয়ে গিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আবার, যার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তিনি প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য হলেও তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হতে পারে।

উদাহরণ ৬.৩: যেমন মনে করো, একটা ছেলে একটা কটকটা রঙের জামা পরেছে, যেটা তার গায়ে মানাচ্ছে না। তার এক বন্ধু তাকে বলল, 'তোর ফ্যাশনজ্ঞানের এই অবস্থা কেন দোস্ত?' এবার উত্তরে ছেলেটা বলল, 'শাহরুখ খান সব সময় এই রঙের জামা পরে। তুই কি বলতে চাস, তোর ফ্যাশনের জ্ঞান শাহরুখ খানের চেয়েও ভালো?'

এখানে প্রথম ছেলেটা Appeal to authority-র ভুল করে ফেলল। শাহরুখ খানকে যদি আমরা ফ্যাশনের জন্য নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনেও নিই, তার উদাহরণ কেন এখানেও প্রয়োগ করা যাবে, সেই যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না।

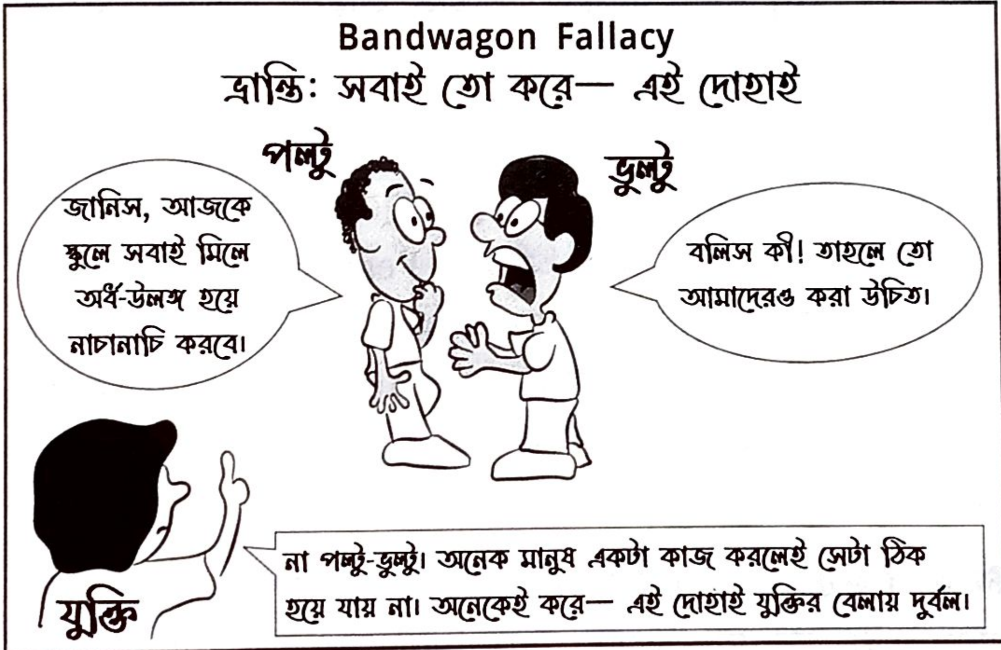
অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে যার বাণী তুমি দিচ্ছ, ওই ব্যাপারে সে আসলেই নির্ভরযোগ্য কি না, তার বাণীটার উৎস নির্ভরযোগ্য কি না, তার বাণী আসলেই প্রাসঙ্গিক কি না, এসব খেয়াল রাখতে হয়।

এবার আমরা আরও একটা ফ্যালাসি দেখব, যেটা অহরহ দেখা যায়। এটাকে বলে Bandwagon Fallacy।

ভ্রান্তির নাম BANDWAGON FALLACY– গড্ডলিকা প্রবাহ ভ্রান্তি: সবাই যা করে তা-ই ঠিক

Bandwagon fallacy ব্যাপারটার মূল কথা সহজ: অধিকাংশ মানুষ যেটা করে, সেটা করাই ঠিক।

এমন করা কি ঠিক? উঁহু, আসলে অধিকাংশ মানুষ একটা কাজ করলেই সেটাকে ঠিক বলা যায় না। একসঙ্গে বহু মানুষ ভুল হতে পারে।



উদাহরণ ৬.৪: ষোড়শ শতাব্দীর দিকে চিন্তা করো। ওই সময় পৃথিবীর একটা বিশাল অংশের মানুষ মনে করত, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এখন সেই সময়ের কোনো মানুষ এভাবে যুক্তি দিতে পারে–

> যেহেতু সবাই বলছে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে [আশ্রয় বাক্য]
>
> একসঙ্গে এত মানুষ ভুল হতে পারে না, তাই সূর্য নিশ্চয়ই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে [সিদ্ধান্ত]

এখন এই সময়ে এসে তুমি জানো যে এমন চিন্তা করা বোকামি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষও একসঙ্গে ভুল হতে পারে। তাই কতজন বলল, এটা দিয়ে ঠিক-বেঠিকের যুক্তি দেওয়াটা একরকমের ফ্যালাসি।

আমাদের সমাজে অবশ্য প্রচলিত মতামতের বাইরে কিছু বলা, কিছু করা সব সময় সুখের নয়। নিকোলাস কোপার্নিকাস যখন সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা দিলেন, তার পক্ষে পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মেনে নিয়েছে এমন নয়। বিজ্ঞানীরাও অনেকে মেনে নেননি। একইভাবে গণিতে সেটতত্ত্বের প্রবক্তা জর্জ ক্যান্টর যখন বলেছিলেন, গণিতে অসীম ধরনের অসীম সংখ্যক অসীম থাকার কথা, তখন গণিতবিদেরাই তাকে মেনে নেননি। ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ মিলতে থাকার কারণে একসময় এগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

যাহোক। সবাই যেটা করছে, সেটাকে ঠিক ভাবা, এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানোর ঝোঁক কিন্তু মানুষের থাকে। ইংরেজিতে FOMO বলে একটা কথা আছে– Fear of Missing Out. এটার মানে হলো: সুযোগ হারানোর ভয়। সবাই করছে আর আমি করছি না, আমি মনে হয় কিছু একটা হারাচ্ছি। এমন অনুভূতি কিন্তু অনেকেরই হয়। আর সেটাকে মার্কেটিংয়ের কৌশল হিসেবে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ৬.৫: ধরো, কোনো টিভি বিজ্ঞাপনে দেখাল চল্লিশ হাজার মানুষ এটা ব্যবহার করেছে। তাই আপনারও এটা ব্যবহার করা উচিত।

কিন্তু খেয়াল করো, যুক্তির বিবেচনায় এটা ধোপে টেকে না। না, চল্লিশ হাজার মানুষ ব্যবহার করলেই এটা ভালো তা নিশ্চিত করা যায় না। যদি নির্ভরযোগ্য একটা রেটিংয়ের ব্যবস্থা থাকে, সেখান থেকে দেখা যায় যে এই চল্লিশ হাজারের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ মানুষ এই পণ্য ব্যবহার করে খুশি, তখন তাদের দাবিকে আমলে নেওয়া যায়।

অনেক সময় কত মানুষ একটা জিনিস কিনছে, সেটা দেখিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো একটা 'পজিটিভ ফিডব্যাক' তৈরি করে। এটা হলো দুষ্টচক্রের উল্টো।

উদাহরণ ৬.৬: মনে করো, বইমেলার বেস্টসেলার তালিকা। একটা বই শুরুতে অনেক বিক্রি হলো। সেটা বেস্টসেলার তালিকায় স্থান পেল। এখন সাধারণ মানুষ যখন বই কিনতে যাবে, তারা আগে দেখবে বেস্টসেলার তালিকা। তাদের মনে হবে, যেহেতু এই বইটা বেশি মানুষ কিনছে, তাহলে এই বইটা ভালো। তখন তারাও হয়তো কিনবে।

এই চক্রের কারণে বেশি বিক্রি হওয়া বইগুলো আরও বেশি বিক্রি হতে থাকে।

কিন্তু এই চক্র থেকে বের হয়ে তোমরা যৌক্তিক ভাবো, একটা বই বেশি বিক্রি হওয়ার মানেই কি সেটা ভালো বই?

উঁহু, তা নিশ্চিত করা যায় না কোনোভাবেই।

তাহলে মূল কথাটা আবার বলি।

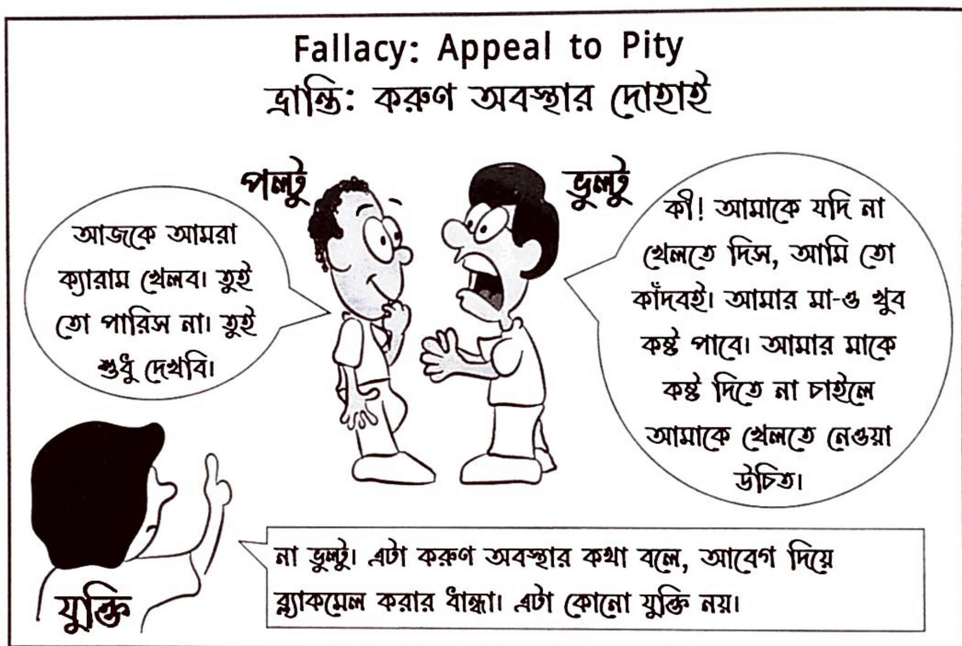
অনেক মানুষ একটা কাজ করলে, সেটাকে 'জনপ্রিয়' বলা যায়, কিন্তু সেটা যে ঠিক তা বলা যায় না।

এনাম বলল, 'জি স্যার। করোনাভাইরাসের মহামারি যখন তুঙ্গে, আমার এক বড় ভাই বলল, বাড়িতে সব বন্ধু মিলে আড্ডা দেবে। আমি মানা করলাম। সে বলেছিল, আরে হোক মহামারি। সবাই তো আড্ডা দিচ্ছে। আমি আর কিছু বলতে পারিনি। এখন Bandwagon Appeal বুঝিয়ে দেব। যা ভুল তা সবাই করলেও ভুল।'

হাসিব হাসে, 'ঠিক তাই'। তোমার ভেতরে একটা বিপ্লবী আবেগ দেখা যাচ্ছে। এবার যে ভ্রান্তির কথা বলব, সেখানে আবেগের ব্যাপার আছে। দেখো, আবেগের দোহাই দিয়ে কী করে ভুল যুক্তি দেওয়া হয়।

ভ্রান্তির নাম APPEAL TO PITY– করুণ অবস্থার দোহাই

আবেগের দোহাই দিয়ে যুক্তি দিতে একসময় বাংলা সিনেমায় বেশ দেখা যেত। এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা হয় তা হলো, যুক্তিদাতা অন্যকে বলে যে দেখো যদি এই ব্যাপারটা ঘটে বা না ঘটে, তাহলে করুণ একটা অবস্থা হবে। এমন একটা অবস্থার কথা হয়তো সে বলবে, যেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তারপর সেই করুণ অবস্থার দোহাই দিয়ে বলবে, এ জন্য আমাদের এটা করা উচিত।



উদাহরণ ৬.৭: বাংলা সিনেমার একটা সংলাপ শোনাই। নায়ক বলছে নায়িকাকে, 'তুমি জানো, তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার কোনো অবলম্বন নেই। তবু তুমি আমাকে ভালোবাসবে না? আমাকে তোমার ভালোবাসতেই হবে।'

হাসিবের সিনেমার সংলাপ নকলের চেষ্টা দেখে সবাই খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিব বলে, 'কাঠখোট্টা মন নিয়ে শুধু যুক্তির কথা ভাবো। একজন মানুষের ভালোবাসা ছাড়া আরেকজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না, যুক্তি বিবেচনায় এটা খুবই দুর্বল বক্তব্য। এই অসম্ভাব্য পরিণতির দোহাই দিয়ে নায়ক নায়িকাকে যুক্তি দিচ্ছে কেন তার ভালোবাসা পাওয়া উচিত। ব্যাপারটা যৌক্তিক না।'

রিতা বলে, 'স্যার, তাই বলে কি আবেগের কোনোই দাম নেই?'

'থাকবে না কেন? আমি বলছি আবেগের দোহাই দিয়ে কুযুক্তি দেওয়ার ব্যাপারটা।

আবেগ অনেক সময়ই মানুষের মনে অদ্ভুত সব আবেদন তৈরি করে। এমন যুক্তি এখনো শোনা যায় অহরহ। আরেকটা উদাহরণ ভাবো।

উদাহরণ ৬.৮: দুই বন্ধু হেঁটে যেতে যেতে একটা বেওয়ারিশ কুকুর দেখল রাস্তার পাশে। এবার একজন বলল অন্যজনকে, 'তোর অবশ্যই উচিত এই কুকুরটাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া। তুই যদি না নিয়ে যাস তাহলে সিটি করপোরেশনের লোকেরা এটাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। ওর মৃত্যুর জন্য তুই দায়ী থাকবি। যদি মৃত্যুর দায় তুই না নিতে চাস এখনই ওটাকে ঘরে নিয়ে যা!'

এমনিতে অসহায় প্রাণী দেখলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা আমাদের মানবতার শিক্ষা। কিন্তু তাই বলে আবেগের দোহাই দিয়ে, মৃত্যুর জন্য দায়ী করে ঘরে নিয়ে যাওয়ার যুক্তিটা ভ্রান্তিসর্বস্ব।

এবার আরেকটা দোহাই তোমাদের শেখাব। এটা যখন জানতাম না, আমি নিজেই মাঝে মাঝে দ্বিধান্বিত হয়ে যেতাম!

ভ্রান্তির নাম ARGUMENT FROM IGNORANCE– প্রমাণ না থাকার দোহাই

এই ধরনের কুযুক্তিকে একটা সহজ কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। 'প্রমাণ না থাকাকে না থাকার প্রমাণ কখনো বলা যায় না।'

উদাহরণ ৬.৯: ধরো, কেউ বলল, ভূত যে আছে সেটার কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই ভূত বলে কিছু নেই।

আরেকজন বলতে পারে, 'ভূত যে নেই, তার কোনো প্রমাণ নেই, অতএব ভূত আছে।'

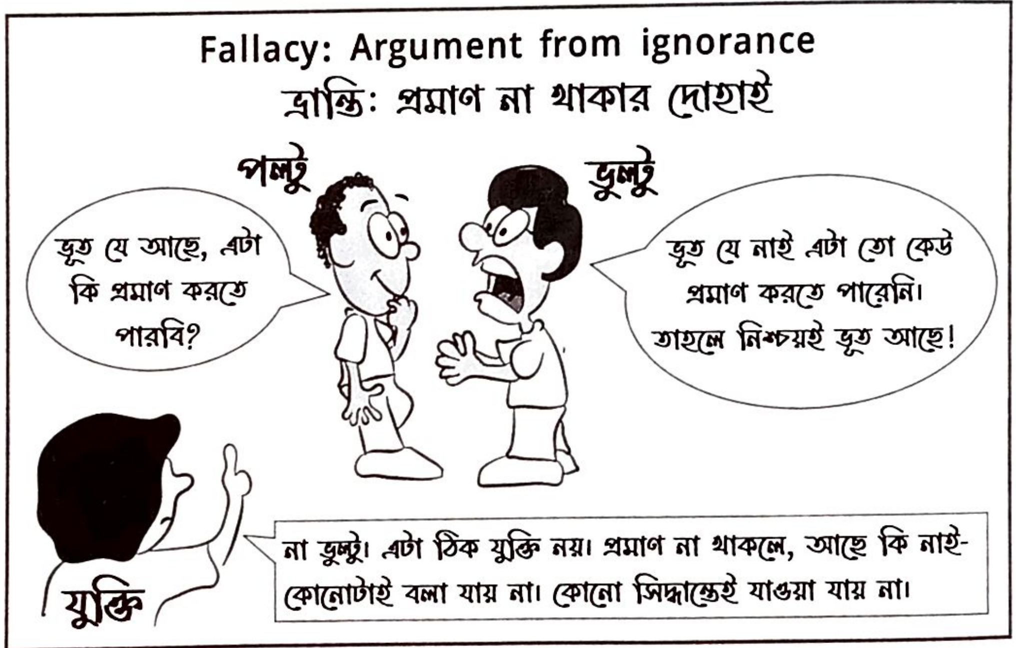
এই দুটোর কোনোটিই আসলে যুক্তির বিবেচনায় ঠিক যুক্তি নয়।

কোনো কিছুর প্রমাণ না থাকলে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

উদাহরণ ৬.১০: কিংবা ধরো, কখগ নামের কেউ একজন খুন হয়েছে। একজন সাক্ষী বলল, 'আমি কখগকে দেখেছিলাম কচটতপ-এর সঙ্গে বের হতে। এরপর কী হয়েছে আমি জানি না।' এই কথা থেকে কচটতপকে খুনি সাব্যস্ত করা যায় না।

অবশ্যই তাকে একজন সন্দেহভাজন হিসেবে রাখতেই পারি, সাক্ষীর শুধু ওইটুকু তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি না।

এই ফ্যালাসি আর False Dichotomy fallacy আসলে খুব কাছাকাছি সম্পর্কিত। 'একটা হয়নি, তাই আরেকটা সত্যি'— এমন চিন্তা Argument from fallacy-এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বিজ্ঞানের ব্যাপারে এই ফ্যালাসি মাঝে মাঝেই আমরা দেখতে পাই।



উদাহরণ ৬.১১: ধরো, একটা লোক মৃত্যুর খুব কাছাকাছি গিয়ে আবার সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। ডাক্তাররাও আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন কিছু মানুষের বক্তব্য,

> ডাক্তাররা বা বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না লোকটা কী করে সুস্থ হলো [আশ্রয় বাক্য]
> সুতরাং নিশ্চয়ই লোকটা অলৌকিক উপায়ে সুস্থ হয়েছে [সিদ্ধান্ত]

না, যুক্তির বিচারে এটা একটা ভ্রান্তি। এখানে খেয়াল করো, বলা হচ্ছে ডাক্তাররা ব্যাখ্যা জানে না। অর্থাৎ এখানে তথ্যের অভাব, একটা অজ্ঞতা বা প্রমাণের অভাব আছে। সেটা থেকে অন্য একটা ঘটনাকে সত্য বলা যায় না।

ডাক্তাররা বা বিজ্ঞানীরা এখনো বহু কিছু জানেন না। কিন্তু তারা প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন জিনিস জানছেন। নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাদের এই মুহূর্তের না জানাকে অন্য কিছুর প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না।

যাহোক, এই ধরনের ফ্যালাসির আরেকটা মজার জাতীয় রূপ আছে। কী হলে কী হতো সেই যুক্তি। বাংলা সিনেমার সংলাপ ভাবো।

উদাহরণ ৬.১২: ছেলে ডিগ্রি পাস করার পর মা বলছে, 'আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত, সারা মহল্লায় মিষ্টি বিলাত।'

যৌক্তিক বিবেচনায় এটা ত্রুটিপূর্ণ। যে বেঁচে নেই, সে বেঁচে থাকলে কী করত, সেটা বলা যায় না। একইভাবে নির্বাচনের যে ওয়াদাগুলো সেগুলোকেও Argument from ignorance দিয়ে বলা যায়। ধরো, একটা দল আছে– কবুতর পার্টি, তারা কখনো নির্বাচনে জেতেনি। কেউ বলল, যদি কবুতর পার্টি জিতত, তাহলে দেশে কোনো দুর্নীতি-অনাচার থাকত না। খেয়াল করো, এটার সমর্থনে কোনো তথ্য-প্রমাণ কিন্তু নেই। ফলে এমন বক্তব্য যুক্তির বিবেচনায় দুর্বল।

অজ্ঞতা বা প্রমাণের অভাব থেকে যেমন কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না, তেমনি নীরবতা থেকেও কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ভ্রান্তির নাম ARGUMENT FROM SILENCE– চুপ থাকার দোহাই

কেউ হয়তো কোনো কথা বলেনি, এ অবস্থায় তার নীরবতাকে যুক্তি হিসেবে আসলে ধরা যায় না। কারণ হলো, নীরবতাকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পক্ষে-বিপক্ষে যেকোনোভাবেই একে ব্যবহার করা

যায়। 'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ'— এটা সমাজে প্রচলিত, কিন্তু যৌক্তিক বিচারে এটা সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়।

উদাহরণ ৬.১৩: দুটো ঘটনা বলি তোমাদের।

ঘটনা ১: রবিন অর্ককে বলল, 'এত বড় অন্যায় হয়ে গেল। আমাদের প্রতিবাদ করা দরকার।' অর্ক কিছু না বলে রবিনের দিকে তাকাল। রবিন বলল, 'আমি জানতাম অন্তত তুই বুঝবি। চল, আমার সঙ্গে।'

ঘটনা ২: রবিন অর্ককে বলল, 'এত বড় অন্যায় হয়ে গেল। আমাদের প্রতিবাদ করা দরকার।' অর্ক কিছু না বলে রবিনের দিকে তাকাল। রবিন বলল, 'ছি অর্ক, তুইও আসবি না। তোর থেকে এটা আমি আশা করিনি, ভেবেছিলাম তুই অন্তত বুঝবি।'

খেয়াল করো, এই চুপ করে থাকাকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। চুপ করে থাকার অর্থটা কী, এটা পরিষ্কার হওয়া যায় না। এই কারণে নীরবতাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

রিতা বলল, 'স্যার, অনেক সময় তো কথা না বললেও মুখের ভঙ্গি বা ইশারায় বুঝিয়ে দেওয়া যায়।'

'অবশ্যই। তবে সেই তথ্য দেওয়া থাকতে হবে', জানায় হাসিব।

'আরেকটা উদাহরণ ভাবো।

উদাহরণ ৬.১৪: কেউ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিল এমন: যখন শোষকের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন হলো, তিনি কোনো কথা বলেন নাই। অতএব তিনি শোষকদের পক্ষে।

রক্ত আগুন করা যুক্তি, কিন্তু যুক্তির বিবেচনায় এখানেও আসলে Argument from silence-এর ভ্রান্তি ঘটেছে। তিনি হয়তো আসলেই শোষকদের পক্ষে, হয়তো না। হয়তো তিনি কথা বলতে ভয় পান। হয়তো সে সময় তিনি তার নিজের জীবনের করুণ অবস্থায় ছিলেন, হয়তো তার এই আন্দোলনের সময় কিছু বলতে তার ভালো লাগছিল না। এমন অনেক অনেক সম্ভাবনা আছে। ফলে তার নীরবতার অজুহাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা যৌক্তিক নয়।

উদাহরণ ৬.১৫: একটা ব্যাপার এখানে বলে রাখি। অনেক সময় নীরবতাকে যোগাযোগ স্থাপনের কিংবা যুক্তি প্রয়োগের দারুণ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন একটা গল্প বলি।

মনে করো, আবুল আর ভুল্টু দুই বন্ধু গল্প করছে।

আবুল: আমি নিশ্চিত ওই বাড়িতে ভূত আছে।

ভুল্টু: তুই কেমন করে নিশ্চিত হচ্ছিস?

আবুল চুপ করে তাকাল ভুল্টুর দিকে, ভ্রু উঁচিয়ে।

ভুল্টু: তাই! ও, তাহলে মনে হয় থাকতেও পারে।

এই কৌশল এত ভালো কাজ করে। কারণ, কাল্পনিক কারণকে প্রায়ই বাস্তব কারণের চেয়ে বেশি ভরসাযোগ্য মনে হয়। যদি কেউ আগেই মন থেকে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত থাকে, এই কৌশল দারুণ কাজ করে। তবে যুক্তিবিদদের কাছে এটা ধোপে টিকবে না। নীরবতা কখনোই যুক্তি বা প্রমাণের জন্য একটি বৈধ পথ নয়।

এবার আমরা আরও একটা ফ্যালাসি নিয়ে কথা বলব। এটাকে বলতে পারো, ঐতিহ্যের দোহাই।

ভ্রান্তির নাম IS-OUGHT– এভাবে হয়ে আসছে, তাই এভাবেই হওয়া ঠিক

ইংরেজি is-ought মানে হলো– হয়, হওয়া উচিত। এই কুযুক্তিটার মূল বক্তব্য এমনই: এভাবে হয়ে আসছে তাই এভাবেই হওয়া উচিত।

উদাহরণ ৬.১৬: ধরো, তোমাদের কোনো বন্ধু বলল, ‘বছরের পর বছর ধরে পয়লা বৈশাখে মানুষ ইলিশ খেয়ে আসছে। তাই আমাদের সবার ইলিশ খাওয়া উচিত।’

মানুষ এভাবে করে আসছে– এটাই তার যুক্তির ভিত্তি। এই ভিত্তি যৌক্তিকভাবে দুর্বল। এই উদাহরণের কথাই বলতে পারি। পয়লা বৈশাখ ইংরেজি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হয়। ওই সময়ে ইলিশ থাকে ছোট অবস্থায় (জাটকা অবস্থায়)। এই অবস্থায় মাছ ধরা হলে পরিণত ইলিশের সংখ্যা কমে, ফলে সারা বছর ইলিশ পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

এনাম বলে, ‘কিন্তু স্যার, সবাই তো খাচ্ছে।’ বলেই এনাম থেমে যায়। ‘ও, মনে পড়েছে। এটাও ঠিক যুক্তি না। Bandwagon Fallacy-তে পড়ে যাবে।’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।’ হাসিব খুশি হয় এনামের ভুল বুঝতে পারায়।



উদাহরণ ৬.১৭: কিংবা ধরো, করোনাভাইরাসের প্রকোপ যখন চলছিল, ঢাকায় জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মেলা না করার সিদ্ধান্ত হলো। এখন কেউ যদি বলে, 'প্রতিবছর জানুয়ারিতে বাণিজ্য মেলা হয়, তাই এ বছরও হওয়া উচিত', তাহলে সেটা ভ্রান্তিতে পড়ে যাবে।

'কিন্তু স্যার', রিতা বলে, 'যে জিনিস বছরের পর বছর হয়ে আসছে, সেটা তো তার মানে একটা স্থায়ী জিনিস, অনেক কিছু পেরিয়ে সেটা টিকে আছে। ব্যাপারটা কি ভালো না?'

'স্থায়িত্বের ব্যাপারটা ভুল না।' কিন্তু আমরা এখানে ঠিক-বেঠিক নিয়ে ভাবছি।

উদাহরণ ৬.১৮: কোনো কিছু বহুদিন ধরে টিকে আছে মানেই যে সেটা ঠিক, এমন তো না। ভারতে বহু বহু বছর ধরে সতীদাহ প্রথা টিকে ছিল। তাতে এটা ঠিক হয়ে যায় না।

উদাহরণ ৬.১৯: কিংবা ধরো, কোথাও একটা খুন হয়েছে। সলিম তার বন্ধু কলিমকে বলল, 'দেখছিস আজকে একটা নৃশংস খুন হয়েছে।' কলিম বলল, 'ব্যাপার না, খুন তো হয়ই।'

কলিমের এই উত্তরও যৌক্তিক নয়, কিছু না। Is-Ought Fallacy-র কারণে ভুল ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। যে ভুলটা ঘটছে, সেটাকে প্রশ্ন না করে সহ্য করে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়।

এবার আরেকটা ফ্যালাসির কথা তোমাদের বলব, যেখানে ভুল হলে সেই ভুলটাকে আশ্রয় করেই আমরা আরও ভুল করতে থাকি। এটাকে বলে Sunk Cost Fallacy।

ভ্রান্তির নাম SUNK COST FALLACY– আরেকটু দেখা যাক

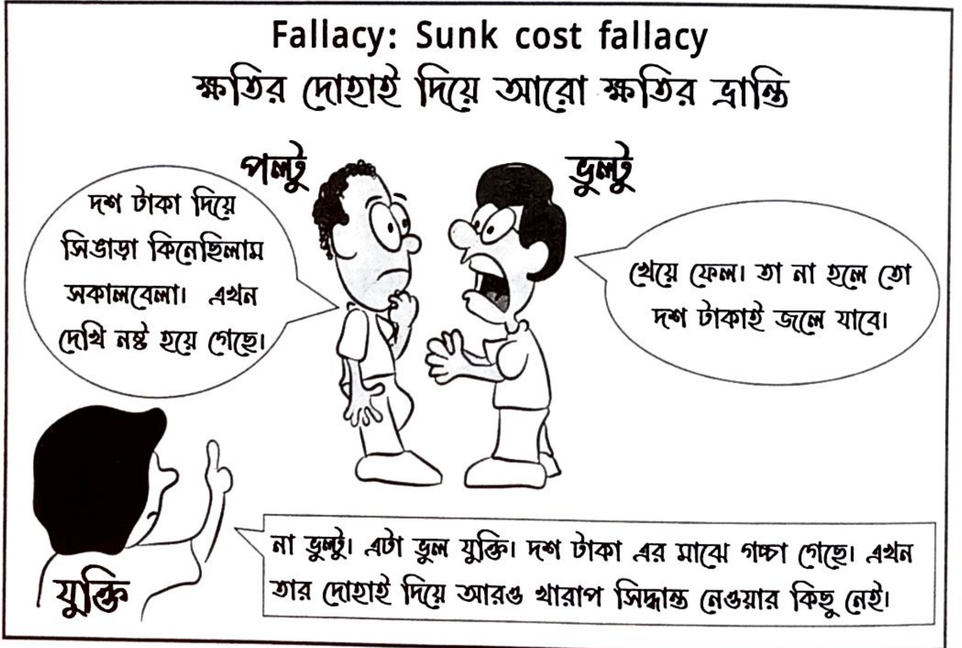
একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। মনে করো, কেউ এমন করে ভাবছে–

উদাহরণ ৬.২০: দশ টাকা দিয়ে দুইটা শিঙাড়া কিনেছিলাম। খেতে ভুলে গেছি। পরের দিন সকালে দেখি এটা নষ্ট হয়ে গেছে। হোক নষ্ট, খেয়েই ফেলি, না খেলে তো পুরো দশ টাকা নষ্ট।

উঁহু, এটা ভুল যুক্তি না। তুমি যদি খাও, ওই দশ টাকা ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে না। সঙ্গে পচা শিঙাড়া খেয়ে পেট খারাপ হওয়ার আশঙ্কা অনেক।

এই ধরনের ভ্রান্তিগুলোকে বলে Sunk Cost Fallacy। এমনিতে Sunk cost শব্দটা ব্যবসাপাতির শব্দ। এর মানে হলো যেই টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে গেছে, আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যুক্তিতে এই ফ্যালাসিটা কখন ঘটে জানো? যখন তুমি ভাবো, আচ্ছা এত দূর যখন ব্যয় করলামই, আরেকটু করে দেখি।

উদাহরণ ৬.২১: একইভাবে মনে করো, তুমি বন্ধুর সঙ্গে একটা সিনেমা দেখছ, দেড় ঘণ্টার সিনেমা। ৪০ মিনিট হয়েছে, দুজনের কারও ভালো লাগছে না। এখন যদি বন্ধুটি তোমাকে বলে, ৪০ মিনিট যখন দেখলামই, ৪০ মিনিট যখন নষ্ট হলোই, আরেকটু দেখি চলো।



এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আগের সময় নষ্টের দোহাই দিয়ে আরও সময় নষ্ট করতে চাওয়াটা কুযুক্তি। একটা ক্ষতির দোহাই দিয়ে ওই ক্ষতি আরও চালিয়ে যেতে চাওয়ার যুক্তি দিলে সেটা যুক্তির ভ্রান্তি।

উদাহরণ ৬.২২: তোমাদের একটু বলি, আমি নিজেও এমন কাজ অনেক করেছি জীবনে। পয়সা উশুল করার চিন্তা করতে গিয়ে ক্ষতি বাড়িয়েছি। একবার বেশ টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের

জিমনেশিয়ামের সদস্য হলাম এক মাসের জন্য। তার কয়েক দিন পরই রিকশা থেকে পড়ে হাতটা গেল ভেঙে। আমি ভাবলাম, এত টাকা দিয়ে সদস্য হলাম, জিম না করলে তো টাকাটা নষ্ট হবে। আমি ভাঙা হাত নিয়েও গেলাম জিম করতে। ব্যস, হাতের ব্যথা বেড়ে-টেড়ে অবস্থা খারাপ। জিম তো হলোই না, ঝামেলা আরও বাড়ল।

খেয়াল করো, যখন হাত ভেঙেছে, তখনই আসলে জিমের সদস্য ফিটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা তখনই Sunk Cost। আমি ওই ক্ষতির কথা চিন্তা করে ক্ষতিটা আরও বাড়ালাম ভাঙা হাত নিয়ে জিম করতে গিয়ে। পরে যখন এই ফ্যালাসিটা পড়েছি, তারপর থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

হাতের ঘড়িতে তাকায় হাসিব। 'ঠিক আছে! আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। পরের সপ্তাহে আরেকটা বিতর্ক হবে। আরও কিছু ভ্রান্তি আমরা দেখব।'

সেদিনের মতো যার যার বাসায় চলে যায় ওরা।

তথ্য ঠিক হলেই কি সিদ্ধান্ত ঠিক

পরের শুক্রবার বিকেলে আবারও হালিম ভাইয়ের চায়ের দোকানে আসে এনাম, সুজন আর রিতা। কিছুক্ষণ পর ওদের সঙ্গে যোগ দেয় হাসিব। আবারও নতুন ব্রিজের পাশে বসে ছোটখাটো একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে হাসিব। আজ সবাই বেশ দারুণ করে যুক্তি দেয়।

হাসিব বলে, 'আমার খুবই ভালো লাগছে যে তোমরা এখন আগের থেকে অনেক সচেতনভাবে যুক্তি দিচ্ছ। আজকেও ছোটখাটো কিছু ভুল ছিল, তবে সেটা নিয়ে ভাবনার তেমন কিছু নেই। আগামী সপ্তাহেই তোমাদের প্রতিযোগিতা। আমার থেকে যুক্তিশিক্ষার আজকেই শেষ ক্লাস। আজকে শেষ কয়েকটা ফ্যালাসি শিখিয়ে দেব তোমাদের।

NON SEQUITUR– IT DOES NOT FOLLOW– নারে পাগলা, ওই সিদ্ধান্তে আসা যায় না

তোমাদের ক্লাসে আমি একদিন বলেছিলাম যে অনেক সময় যুক্তিতে প্রেমিস বা আশ্রয় বাক্য ঠিক থাকে কিন্তু যুক্তির পথটা বা যুক্তি তৈরির প্রক্রিয়া ভুল হয়, সেই ধরনের ভ্রান্তিকে বলে 'Formal Fallacy'। এদের আরেকটা রোমান নাম আছে Non Sequitur, যার ইংরেজি হলো it does not follow। বাংলায় বললে, 'নারে পাগলা, এখান থেকে ওই সিদ্ধান্তে আসা যায় না।'

এমন কতগুলো ভুল যুক্তির উদাহরণ দিচ্ছি।

ভ্রান্তির নাম BAD REASONS FALLACY– দুর্বল যুক্তির ভ্রান্তি



উদাহরণ ৭.১: ধরো, অফিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী অধস্তন নতুন একজনকে নিয়ে বলছে, ‘নতুন যে কর্মচারী এসেছে, সে দেখতে-শুনতে ভালো না। আমাদের তাকে বরখাস্ত করা উচিত।’

এখানে সমস্যাটা কী বলতে পারো?

এনাম বলে, ‘জি স্যার, এটা বোঝা যাচ্ছে। নতুন কর্মচারী তার কাজে কেমন সেটা না দেখে শুধু চেহারা দেখে বরখাস্ত করা যায় না।’

হ্যাঁ, Bad reason fallacy-তে যেটা হয় তা হলো, আশ্রয় বাক্য আর সিদ্ধান্তের ভেতরে কোনো স্পষ্ট কিংবা সঠিক সম্পর্ক থাকে না।

আরেকটা উদাহরণ দিই।

উদাহরণ ৭.২: মনে করো, চমক হাসান নামে কেউ একজন অনলাইনে অঙ্কের ভিডিও বানায়। তার একজন ভক্ত এটা দেখে বলল,

> চমক হাসান ভালো অঙ্কের ভিডিও বানায় (আশ্রয় বাক্য)
> সুতরাং তার শিক্ষামন্ত্রী হওয়া উচিত (সিদ্ধান্ত)

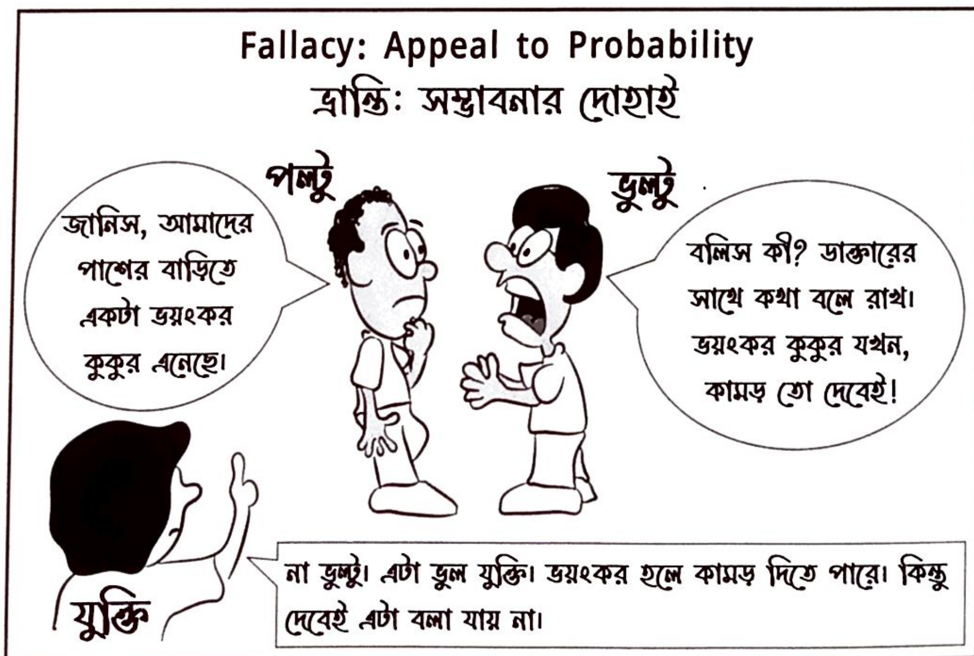
এটাও একটা Non Sequitur ভ্রান্তির উদাহরণ। আরও ভালো করে বললে এটা Bad reasons fallacy-এর নমুনা। আশ্রয় বাক্যটাকে আমরা যদি ঠিকও ধরে নিই, সেটা সিদ্ধান্তের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক।

অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে এটা ভেবে যে দুটোই তো শিক্ষা-সম্পর্কিত। কিন্তু দেখো, অনলাইনে অঙ্কের ভিডিও বানাতে পারা, আর সরকারি প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়া– দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিস। অঙ্কের ভিডিও ভালো বানায়– শুধু এই তথ্য থেকে তার শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এটার কাছাকাছি আরেকটা Non sequitur জাতীয় ভ্রান্তি আছে। তাকে বলে Appeal to probability। এখানে বক্তা এভাবে যুক্তি দেয় যে এটা হতে পারে, অতএব এটা হবে।

ভ্রান্তির নাম APPEAL TO PROBABILITY– সম্ভাবনার দোহাই

তোমরা কি মার্ফি'স ল (Murphy's law) জানো? এটা আসলে কোনো সত্যিকারের সূত্র না। এমনি মজা করে বলা একটা কথা, Anything that can go wrong will go wrong। যা খারাপ হতে পারে, সেটা খারাপ হবেই।



বাংলায় প্রবাদ আছে, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়'। এগুলো রঙ্গরসের জন্য খারাপ না। কিন্তু কেউ যদি এটাকে যুক্তি-প্রমাণের জন্য আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করে, তখন সমস্যা।

উদাহরণ ৭.৩: যেমন ধরো, কেউ বলল,

আজকে বৃষ্টি হতে পারে [আশ্রয় বাক্য]

সুতরাং আজকে আমার বাসায় ফিরতে কষ্ট হবে [সিদ্ধান্ত]

খেয়াল করো, বৃষ্টি হতে পারে। তার মানে বৃষ্টিটা এখনো অনিশ্চিত। সুতরাং কষ্ট হবেই এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া যায় না।

'স্যার, যদি সে হবে না বলে হতে পারে বলত, তাহলে কি কথাটা যুক্তিসংগত হতো?' এনাম জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, তাতে অসুবিধা ছিল না। চলো, আরেকটা উদাহরণ ভাবি।'

উদাহরণ ৭.৪: মনে করো, একজন এভাবে যুক্তি দিচ্ছে—

পোষা কুকুরও কিন্তু কামড় দিতে পারে [আশ্রয় বাক্য]

আমাদের পাশের বাড়ির কাকা একটা কুকুর নিয়ে এসেছে [আশ্রয় বাক্য]

অতএব আমার জীবন শেষ [সিদ্ধান্ত]

এখানেও যুক্তির একটা লাফ আছে। কামড় দিতে পারে মানে এই নয় যে কামড়াবেই। একেবারে জীবনের আশঙ্কা করাটা অযৌক্তিক। অনেক সময় Appeal to probability মানুষ ভালো পরামর্শ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। সেখানে ভ্রান্তি কোনটুকু, সেটা বুঝে নিয়ে ভালোটুকু নিয়ে রাখতে পারো।

উদাহরণ ৭.৫: মনে করো, একজন এভাবে যুক্তি দিচ্ছে—

'আজকাল চোর-ডাকাত খুব বেড়েছে। দরজা ভালো করে বন্ধ করে রাখবেন। একদিন খোলা রাখবেন, দেখবেন সেই দিনই চোর ঢুকবে: পরামর্শটা খারাপ না, কিন্তু যৌক্তিক বিবেচনায় 'একদিন খোলা রাখলে সেই দিনই চোর ঢুকবে' এটা বলা যায় না। ঢুকতে পারে, সেই সম্ভাবনা আছে। ঢুকবেই- সেটা বলা যায় না।

একইভাবে সম্ভাবনা কম তাই এটা ঘটবে না, অমনটা বলাও ভ্রান্তিকর।

এবার একটা ভ্রান্তির কথা তোমাদের বলি, যেখানে যুক্তিটা বোঝার ভুল আছে। কী কথা থেকে কী কথা বলা যায়, সেটা বোঝাটা জরুরি।

ভ্রান্তির নাম AFFIRMING THE CONSEQUENT– অনুবর্তী থেকে পূর্ববর্তী প্রমাণ

এই ব্যাপারটা এমন। ধরো, প্রথম ঘটনা সত্যি হলে দ্বিতীয় ঘটনা সত্যি হয়। এখন তুমি দেখলে দ্বিতীয় ঘটনা সত্য। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত দিলে তাহলে প্রথমটাও সত্য হবে।

এটা আসলে ভুল। একটু বুঝিয়ে বলি, চলো।

Fallacy: Affirming the Consequent
ভ্রান্তি: অনুবর্তী থেকে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত

পল্টু
ভুল্টু
আমি দেখেছি, কারেন্ট না থাকলে আমাদের ক্লাসের ফ্যানটা চলে না।
আজকে ফ্যানটা চলেনি। তাহলে নিশ্চয়ই আজকে কারেন্ট ছিল না।
যুক্তি
না ভুল্টু। এটা ভুল যুক্তি। পরেরটা থেকে আগেরটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমন হতেই পারে যে ফ্যান নষ্ট কিংবা সুইচ নষ্ট, অথবা কারেন্টের তার নষ্ট।

উদাহরণ ৭.৬: ধরো, কেউ একজন এভাবে যুক্তি দিচ্ছে–

> যদি কোনো প্রাণী মানুষ হয়, তাহলে তার দুইটা পা থাকবে [আশ্রয় বাক্য]
>
> আজকে একটা প্রাণী দেখেছি, যার দুইটা পা [আশ্রয় বাক্য]
>
> তাহলে নিশ্চয়ই প্রাণীটা মানুষ [সিদ্ধান্ত]

খেয়াল করে দেখো, প্রথম কথাটা পুরোপুরিই ঠিক আছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঠিক নেই। দুই পা-ওয়ালা প্রাণী তো কতই হতে পারে।

পথটা একমুখী, এমন চিন্তা করতে পারো। উল্টো পথটা সত্য নাও হতে পারে। আরও কয়েকটা উদাহরণ ভাবি চলো।

উদাহরণ ৭.৭: ধরো, কেউ একজন এভাবে যুক্তি দিচ্ছে–

> যদি তেলচালিত গাড়িতে তেল না থাকে তাহলে গাড়ি চলে না [আশ্রয় বাক্য]
>
> আমি দেখলাম একটা গাড়ি চলছে না [আশ্রয় বাক্য]
>
> তাহলে নিশ্চয়ই গাড়িতে তেল নেই [সিদ্ধান্ত]

খেয়াল করে দেখো, প্রথম কথাটা পুরোপুরিই ঠিক আছে। তারপরও কিন্তু সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা যায় না। গাড়ি না চলার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হতে পারে কিংবা গাড়িটা হয়তো কেউ স্টার্টই দেয়নি। তাই যুক্তির এই পথ ভুল। যদি কেউ বলত,

> যদি তেলচালিত গাড়িতে তেল না থাকে তাহলে গাড়ি চলে না [আশ্রয় বাক্য]
>
> আমি দেখলাম একটা গাড়িতে তেল নেই [আশ্রয় বাক্য]

তাহলে নিশ্চয়ই গাড়িটা চলছে না [সিদ্ধান্ত]

এটা ঠিক আছে।

এনাম জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, consequent কী জিনিস?'

আচ্ছা। ইংরেজিতে antecedent আর consequent বলে দুটো শব্দ আছে। antecedent মানে পূর্ববর্তী আর consequent মানে অনুবর্তী। ধরো, আমরা যখন বলি, এটা হলে ওটা হবে, তখন প্রথমটাকে বলে antecedent আর পরেরটাকে বলে consequent।

তেল না থাকলে, গাড়ি চলে না। এখানে antecedent হলো 'তেল না থাকলে' আর consequent হলো 'গাড়ি চলে না'।

'মেঘ না হলে বৃষ্টি পড়ে না'। এখানে antecedent হলো 'মেঘ না হলে' আর consequent হলো 'বৃষ্টি পড়ে না'।

Affirming the consequent বললে বোঝায় পরেরটাকে ঠিক দেখে প্রথমটাকে ঠিক ভাবা। বৃষ্টি পড়েনি দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে মেঘ নেই। এটা ভুল চিন্তা। আরও একটা উদাহরণ তোমরা কি ভাবতে পারো?

উদাহরণ ৭.৮: এনাম বলে, 'ধরা যাক কেউ বলল, লাইটের সুইচ না দিলে আলো জ্বলে না। এখন কেউ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢুকে দেখল আলো জ্বলেনি। তাহলে নিশ্চয়ই সুইচ দেওয়া হয়নি।'

'বাহ। সুন্দর উদাহরণ। এখানে ভুলটা কোথায় বলো তো?'

'আলো না জ্বলার আরও কারণ থাকতে পারে। এমন হতে পারে, সুইচ দেওয়া আছে ঠিকই কিন্তু কারেন্ট নেই। এনাম বলে।

'কিংবা লাইটটা নষ্ট হয়ে গেছে,' রিতা বলে।

'ঠিক। যখন একাধিক কারণে একটা ঘটনা ঘটতে পারে, তখন শুধু ওই ফলাফল দেখে কারণটাকে নিশ্চিত করে বলা যায় না।'

রিতা জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে স্যার, যদি এমন হয়, শুধু একটা কারণে একটা ফল হয়। তাহলে কি ফল দেখে কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে?'

'সুন্দর প্রশ্ন। উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন যাবে। একটা উদাহরণ ভাবো।'

উদাহরণ ৭.৯:

> কোনো প্রাণী মারা গেলে শুধু তখন তার হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় [আশ্রয় বাক্য]
>
> একটা প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে [আশ্রয় বাক্য]
>
> তাহলে নিশ্চয়ই প্রাণীটা মারা গেছে [সিদ্ধান্ত]

এটা ঠিক যুক্তি। এখানে শুধু তখন কথাটা আমাদের আর কোনো কারণ থাকার সুযোগ দিচ্ছে না। এই অবস্থায় ফলাফল দেখেই আমরা কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

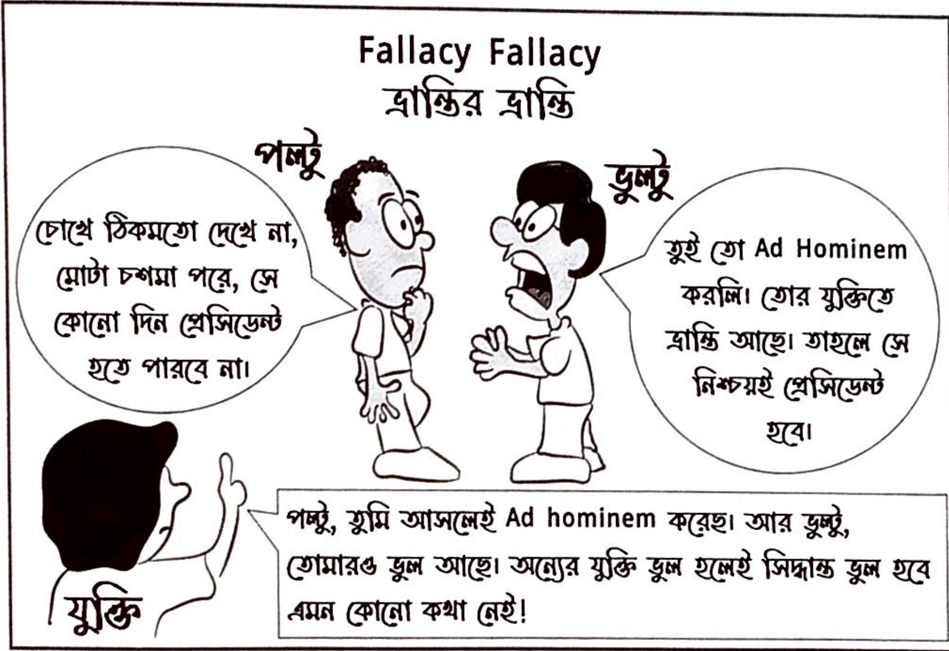
আমরা আমাদের ফ্যালাসি-সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করব আরেকটা ফ্যালাসি দিয়ে, যেটার কথা আগেও তোমাদের বলেছি।

এনাম জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, পৃথিবীর সব ফ্যালাসি কি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন?'

'আরে না! আরও অনেক অনেক রকমের ফ্যালাসি আছে। আমি শুধু আমার পছন্দের কয়েকটা বললাম। এগুলো জানাটা আমার মনে হয় শুরুর জন্য ভালো। চলো, তাহলে শেষ ফ্যালাসির দিকে তাকানো যাক। এটার নাম ফ্যালাসি ফ্যালাসি।

ভ্রান্তির নাম FALLACY FALLACY– ফ্যালাসি থাকলেই কি সিদ্ধান্ত ভুল?

এটা তোমাদের আবারও বলছি, তোমাদের সতর্ক করে দিতে। এই ভ্রান্তিটা আমাদের বলে যে একটা যুক্তিতে ভ্রান্তি থাকলেই সিদ্ধান্ত ভুল, এটা নিশ্চিত হওয়া যায় না। শুধু ভ্রান্তি থাকাটাই সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট না। একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝাই।



উদাহরণ ৭.১০: একটু আগের উদাহরণটা আবার ভাবো,

> যদি তেলচালিত গাড়িতে তেল না থাকে তাহলে গাড়ি চলে না [আশ্রয় বাক্য]
>
> আমি দেখলাম একটা গাড়ি চলছে না [আশ্রয় বাক্য]
>
> তাহলে নিশ্চয়ই গাড়িতে তেল নেই [সিদ্ধান্ত]

এই যুক্তি দেখে তুমি যুক্তি দিলে

ওপরের যুক্তিতে Affirming the consequent নামের একটা ফ্যালাসি হয়েছে [আশ্রয় বাক্য]

অতএব ওপরের যুক্তির সিদ্ধান্ত ভুল, আসলে গাড়িতে তেল আছে [সিদ্ধান্ত]

সেটাও আসলে তুমি বলতে পারো না। তেল তো আসলেও না থাকতে পারে। এমন করে বললে সেটা হবে fallacy fallacy। ভ্রান্তির ভ্রান্তি।

যে যুক্তিটা দিয়েছে সে ভুল পথেও ঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারে।

সুজন, তুমি কি এমন আরেকটা উদাহরণ দিতে পারো?

উদাহরণ ৭.১১: সুজন বলল, 'ধরেন কেউ বলল, চরিত্রহীন কোথাকার, তুই পড়ালেখার কী জানিস? এটা শুনে আমি বললাম, Ad hominem। কারও চরিত্রহীন হওয়ার সঙ্গে পড়ালেখার সম্পর্ক নেই। সুতরাং ও আসলে পড়ালেখায় ভালো। আমি যদি এমন বলি, তাহলে আমার এটা বলাটাও ঠিক হবে না।'

হাসিব হাসে, 'চরিত্র-টরিত্র কেন নিয়ে এলে বুঝতে পারলাম না। যাহোক তোমার উদাহরণ ঠিক আছে।'

আমি আসলে তোমাদের এটাই সতর্ক করে দিতে চাইছিলাম। এখন তো তোমরা একটু একটু ভ্রান্তি বিষয়ে জানো। সে জানাটাই তোমাদের যেন ভুল করার পথ না দেখায়।

ভ্রান্তির পরে

হাসিব উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমাদের ভ্রান্তির ক্লাস এ পর্যন্তই। তোমাদের যাদের আগ্রহ আছে উইকিপিডিয়াতে 'list of fallacies' নামের নিবন্ধটি পড়তে পারো। ওখানে নানা রকম ফ্যালাসির তালিকা পাবে। সেগুলোর প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা নিবন্ধও পাবে। একটা একটা করে সেগুলোর লিঙ্কে গিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

সামনেই তোমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতার সময় তো বটেই, চেষ্টা করবে এই ভ্রান্তিগুলো সব সময় মাথায় রাখতে।

নামটা মনে না রাখলেও চলবে কিন্তু ভ্রান্তিটা মনে রেখো। যুক্তি দেওয়ার সময় খেয়াল রেখো, প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ কি না, বক্তব্যকে বদলে ফেলছ কি না, হুট করে সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছ কি না, উল্টোপাল্টা দোহাই দিচ্ছ কি না, যে তথ্য দিচ্ছ সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসার পথটা ঠিক কি না। সব সময় এগুলো খেয়াল রাখব, ঠিক আছে।'

'আচ্ছা স্যার,' সবাই একসঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

'আচ্ছা, তাহলে ভ্রান্তির আলোচনা এখানেই শেষ! চলো ঘরে ফেরা যাক।'

সবাই উঠে দাঁড়ায়। তারপর নতুন ব্রিজের পাশের রাস্তাটা ধরে ধীরপায়ে হাঁটতে থাকে। সূর্যটা দিগন্তে হেলে পড়ে। চারজন মানুষের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

গল্পের শেষে

আন্তনগর মধুমতী এক্সপ্রেসের ভেতরে বসে আছে হাসিব। এবার গন্তব্য ঢাকা। পোড়াদহ জংশনে গিয়ে ট্রেন বদলাতে হবে। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা। এরপর গভীর রাতে উঠবে সুন্দরবন এক্সপ্রেসে। পরদিন সকালেই ট্রেন পৌঁছে যাবে ঢাকা। মা-বাবা বলেছিলেন বাসে করে আসতে। আরিচা ঘাট দিয়ে ফেরি পার হলে এসি বাসে পাঁচ ঘণ্টায় খোকসা থেকে ঢাকায় পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু আসার পথে ট্রেনের ভ্রমণটা দারুণ লেগেছিল। ওই আয়েশি দুলুনিটা আবার অনুভব করতে ইচ্ছে করছিল।

হুট করে হাসিবের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা, যেদিন এসেছিল 'শোমসপুর উচ্চবিদ্যালয়ে' যোগ দিতে। মনে পড়ে যায় আরও অনেক কিছু...।

একটা বছর মনে হয় ঝড়ের বেগে পার হয়ে গেল। এর মধ্যে হাসিব বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে পেরেছে স্কুলে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা বিতর্ক দল বানিয়েছিল। সেটা থানা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কুষ্টিয়া সদরে গিয়ে বিতর্ক করেছে ওখানকার দলের সঙ্গে। জেলা পর্যায়ে রানারআপ হওয়ায় আর বিভাগীয় পর্যায়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে ওরা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আরও ভালো করার ব্যাপারে।

অষ্টম শ্রেণির ওই দলটা ভালো করার পরে স্কুলে বিতর্কের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। একটা বিতর্ক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সেই ক্লাবের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা একটা বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল ওর জন্য। ক্লাবের সভাপতি এনাম বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিল,

'স্যার, আপনি চলে গেলে আমাদের বিতর্ক মনে হয় আর আগাবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। আমাদের জন্য হলেও আপনার থেকে যাওয়া উচিত।'

শুনে হাসিবের ঠোঁটের কোনায় একটা ছোট্ট হাসি ফুটে উঠেছিল। এনাম তাড়াতাড়ি সংযত হয়ে বলেছিল, 'আমি জানি স্যার, এটাও ভ্রান্তি। এটা Appeal to pity। তারপরেও কি থেকে যাওয়া যায় না?'

হাসিব আসলে অনেক ভেবেছে। না, আর থাকা ওর পক্ষে সম্ভব না। সত্যি বলতে, বহুদিন মহানগরীতে থাকার পর সেখানকার গতির সঙ্গে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, এখানে প্রথম কয়েকটা মাস খুব ভালো লাগলেও, হাঁসফাঁস লাগা শুরু হয়েছিল চার মাস পরেই।

ওখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বৃত্তির জন্য খোঁজ নিতে শুরু করে। GRE পড়তে শুরু করে। ঢাকা ফিরেই শিক্ষকদের রিকমেন্ডেশন লেটার জোগাড় শুরু করতে হবে। তারপর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ই-মেইল পাঠানো শুরু করবে, গবেষণায় আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপর সব ঠিক থাকলে বাইরে পড়তে যাবে পরের আগস্টে।

ভাবতে গিয়ে হাসিব হাসে, Slippery slope মানে পিচ্ছিল ঢাল ধরে বেশি দূর গড়িয়ে গেল নাকি ভাবনাটা? কল্পনার প্রসঙ্গ শোমসপুর হাইস্কুল থেকে ঘুরে একেবারে আমেরিকায় চলে গেল। Red Herring বলা যায় কি?

আবার ভাবে, স্কুলটার কথা। গ্রামটার কথা। চলে যেতে হচ্ছে, কিন্তু ও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। হাসিব ভাবে, এই কদিন গ্রামে, মাটির কাছাকাছি থাকার যে সিদ্ধান্ত ও নিয়েছিল, সেটা খুবই অসাধারণ ছিল। সহজ-সরল, অতিথিপরায়ণ মানুষগুলো ওকে এতটা আপন করে নেবে– ও কখনো ভাবতেও পারেনি। সিদ্ধান্তটা কি আবেগের বশেই নিয়েছিল ও? হ্যাঁ, আবেগ ছিল। কিন্তু মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তির কষ্টিপাথরে বহুবার পরখ করে নিয়েছিল।

হাসিব অন্তর থেকে অনুভব করে, আবেগ কখনোই যুক্তির বিপরীত নয়, যেমনটা বহুজনে মনে করে। বরং ওরা একে অন্যের সহযোগী।

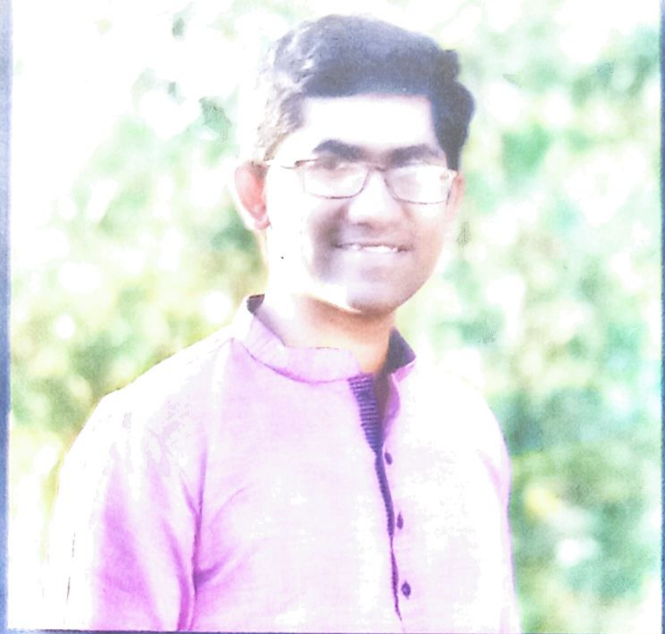
মানুষের ভেতরে এদের চমৎকার সহাবস্থান। আবেগপ্রবণ হওয়ায় দোষের কিছু নেই। শুধু যুক্তিবোধটাকে শাণিত রাখতে হবে, যেন আবেগ আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য না করে।

আহ, যদি পৃথিবীর সবাই হুটহাট করে কথা না বলে ফেলে, বলার সময় একটু ভাবত! যদি সেগুলোকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে বলত, পৃথিবীটা হয়তো আরেকটু সুন্দর হতো।

ভেবেই থেমে যায় হাসিব, হতো কী?

ভ্রান্তি আর যুক্তির ভাবনার অতলে ডুবে যায় ও। ট্রেন পেরিয়ে যায় স্টেশনের পর স্টেশন– কুমারখালী, চড়াইকোল, কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া কোর্ট, জগতি...।





চমক হাসানের জন্ম ২৮ জুলাই, ১৯৮৬, কুষ্টিয়ায়। বাবা আহসানুল হক, মা নওরাজিস আরা জাহান। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া কুষ্টিয়াতেই। এরপর বুয়েট থেকে তড়িৎকৌশলে স্নাতক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন বোস্টন সায়েন্টিফিক করপোরেশনে। স্ত্রী ফিরোজা বহ্নি ও কন্যা বিনীতা বর্ণমালার সঙ্গে থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারিটা শহরে।

তার ভালো লাগে গাইতে, পড়তে, শিখতে, শেখাতে। তিনি আশাবাদী মানুষ, স্বপ্ন দেখেন আলোকিত ভবিষ্যতের, যখন এ দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দ নিয়ে লেখাপড়া করবে, প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না, মুখস্থ করে পাস করবে না। ওরা অনুভব করবে কেন, কীভাবে, কী হচ্ছে! তিনি মনে করেন গণিত অলিম্পিয়াডের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। নিজেকে তিনি সেই আন্দোলনের একজন কর্মী ভাবতে গর্ববোধ করেন। গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমির প্রশিক্ষক, প্রশ্নপ্রণেতা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন।

পাঠকের যেকোনো মন্তব্য তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্য জানাতে পারেন ই-মেইল কিংবা ফেসবুকে তার অফিশিয়াল পেজে।

ই-মেইল: chondrochari@gmail.com
ফেসবুক পেজ: www.facebook.com/chamok.hasan

প্রকাশিত গ্রন্থ

অঙ্ক ভাইয়া
গণিতের রঙ্গে: হাসিখুশি গণিত
নিমিখ পানে: ক্যালকুলাসের পথ পরিভ্রমণ
নিমিখ পানে: যোগজীকরণের গল্প
গল্পে-জল্পে জেনেটিক্স (১ম খণ্ড)
গল্পে-জল্পে জেনেটিক্স (২য় খণ্ড)

এই বইয়ে ২৪টি logical fallacy বা যুক্তির ভ্রান্তি নিয়ে গল্প করা হয়েছে, মজার সব উদাহরণ দিয়ে।

বইয়ের মূল চরিত্র হাসিব, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেই শখের বশে যোগ দেয় গ্রামের স্কুলে, শিক্ষক হিসেবে। গণিত-বিজ্ঞানের শিক্ষক হলেও সে দ্রুতই বুঝতে পারে, ছাত্রছাত্রীদের যুক্তিবোধ শাণিত করাটাই আগে জরুরি। তাদের ফড়িংয়ের মতো অস্থির মন যেন কুযুক্তির ফাঁদে পড়ে পথ না হারায়, এ জন্য তাদের সে শোনায় যুক্তির নানা ভ্রান্তির গল্প। গল্প শোনাতে শোনাতে সে-ও কি একটু একটু করে নিজেকে আবিষ্কার করে?

৳ 240 ~Logic



9 789849 598398

